ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ৪র্থ পত্র: উসূলুল ইফতা ওয়াল ফিকহুল মুকারান

খ বিভাগ: ফিকহুল মুকারান (রচনামূলক প্রশ্ন)

আল ফিকহ ওয়াল ফিকহুল মাযহাবী

প্রশ্ন-০১: ফিকহ-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। শরয়ী অন্যান্য ইলম থেকে একে আলাদা করার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? [عرف الفقه لغة واصطلاحا، وما هي خصائصه التي تميزه عن غيره من العلوم الشرعية؟]

প্রশ্ন-০২: ফিকহের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য (লক্ষ্য) কী? মুসলিম উম্মাহর জীবনে ফিকহের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট কর। [ما هو موضوع الفقه وغرضه (هدفه)؟ وضح أهمية الفقه وفضله في حياة الأمة المسلمة.]

প্রশ্ন-০৩: ফিকহের সেই অপরিহার্য বিষয়গুলো কী কী, যা ছাড়া কোনো মুসলমান তার ইবাদত ও মুআমালাত-এ চলতে পারে না? [ما هي ضروريات الفقه التي لا يستغني عنها المسلم في عباداته ومعاملاته؟]

প্রশ্ন-০৪: 'আল-ফিকহুল মাযহাবী' (মাযহাবী ফিকহ)-এর সংজ্ঞা কী? যুগের পর যুগ ধরে এর উৎপত্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো কী কী? [ما تعريف "الفقه المذهبي"؟ وما هي العوامل التي أدت إلى نشأته وتعداده عبر العصور؟]

প্রশ্ন-০৫: চারটি ফিকহী মাযহাবের (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস-এর মতো) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিগুলো উল্লেখ কর। এই মূলনীতিগুলো ব্যবহারে প্রতিটি ইমামের পদ্ধতি আলোচনা কর। [اذكر أهم أصول المذهب الفقهي الأربعة (كالكتب والسنة والإجماع والقياس)، وناقش منهج كل إمام في استخدام هذه الأصول.]

প্রশ্ন-০৬: প্রতিটি ইমামের ফিকহী পদ্ধতি কীভাবে বিধি-বিধান উদ্ভাবন এবং মাযহাবের ফিকহী মতামতের বৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব ফেলেছে? [كيف أثر المنهج الفقهي لكل إمام على استنباط الأحكام وتنوع الآراء الفقهية في المذهب؟]

আল ফিকহুল মুকারান (তুলনামূলক ফিকহ)

প্রশ্ন-০৭: 'আল-ফিকহুল মুকারান' (তুলনামূলক ফিকহ)-এর সংজ্ঞা দাও। উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির দিক থেকে আল-ফিকহুল মাযহাবী থেকে এর পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। [عرف "الفقه المقارن"، واشرح الفرق بينه وبين الفقه المذهبي في الغرض والمنهج.]

প্রশ্ন-০৮: আধুনিক যুগে একজন শিক্ষার্থীর জন্য তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের গুরুত্ব কী? এ অধ্যয়নের লক্ষ্য স্পষ্ট কর। [ما هي أهمية دراسة الفقه المقارن للطالب في العصر الحديث؟ وضح الهدف من هذه الدراسة.]

প্রশ্ন-০৯: ইসলামের বিভিন্ন যুগে তুলনামূলক ফিকহের উৎপত্তি ও বিকাশ আলোচনা কর, এর প্রধান ধাপগুলো উল্লেখ কর। [ناقش نشأة الفقه المقارن وتطوره في عصور الإسلام المختلفة، مع الإشارة إلى أهم المراحل التي مر بها.]

প্রশ্ন-১০: তুলনামূলক ফিকহে বিভিন্ন ইমামের মতামত ও তাদের দলীল অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রত্যাশিত উপকারিতাগুলো কী কী? [ما هي الفوائد المرجوة من دراسة آراء الأئمة المختلفة وأدلتهم في الفقه المقارن؟]

প্রশ্ন-১১: বিগত যুগগুলোতে তুলনামূলক ফিকহ বিজ্ঞান বিকাশে অবদান রেখেছেন এমন প্রধান আলেমদের নাম উল্লেখ কর। [اذكر أبرز العلماء الذين أسهموا في تطوير علم الفقه المقارن في العصور المتأخرة.]

প্রশ্ন-১২: ফিকহী মাযহাবের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও তুলনামূলক ফিকহ কীভাবে ইসলামী উম্মাহর ঐক্যকে সেবা করে? [كيف يخدم الفقه المقارن وحدة الأمة الإسلامية على الرغم من تعدد المذاهب الفقهية؟]

তুলনামূলক ফিকহ গবেষণার পদ্ধতি

প্রশ্ন-১৩: 'তুলনামূলক ফিকহে গবেষণার পদ্ধতি কী? এর মৌলিক ধাপগুলো ক্রমানুসারে গণনা কর। [ما هي "طريقة البحث في الفقه المقارن"؟ وعدد خطواتها الأساسية بتسلسل.]

প্রশ্ন-১৪: তুলনামূলক গবেষণায় 'মাসআলার চিত্রায়ণ' অথবা 'বিরোধের স্থান নির্ধারণ ও স্পষ্টকরণ' ধাপটি ব্যাখ্যা কর। [اشرح خطوة "تصوير المسألة" أو "تحديد وتحرير محل النزاع أو الخلاف" في البحث المقارن.]

প্রশ্ন-১৫: একজন গবেষক কীভাবে কোনো মতভেদপূর্ণ মাসয়ালায় 'আলেমগণের মতামত ও তাদের দলীলসমূহ বর্ণনা' করবেন? এবং সংশ্লিষ্ট সমালোচনাও 'গুরুত্ব' স্পষ্ট কর। [كيف يقوم الباحث بـ"بيان آراء العلماء وأدلتهم" في مسألة خلافية؟ وضح أهمية النقد الموضوعي.]

প্রশ্ন-১৬: তুলনামূলক ফিকহে 'আলোচনা ও অগ্রাধিকার প্রদান (তারজীহ)'-এর মূলনীতিগুলো কী কী? গবেষক কীভাবে অগ্রাধিকারযোগ্য মতের কাছে পৌঁছাবেন? [ما هي ضوابط "المناقشة والترجيح" في الفقه المقارن؟ وكيف يصل الباحث إلى القول الراجح؟]

প্রশ্ন-১৭: প্রাচীন ও আধুনিক – উভয় সময়ের তুলনামূলক ফিকহে রচিত তিনটি প্রধান 'গ্রন্থাবলি' এবং তাদের লেখকদের নাম উল্লেখ কর। [اذكر ثلاثة من أبرز "المؤلفات في الفقه المقارن" قديما وحديثا، مع ذكر مؤلفيها.]

প্রশ্ন-১৮: ইমাম ইবনে রুশদ তাঁর 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুক্তাসিদ' কিতাবে কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন? এ কিতাবটি কীভাবে তুলনামূলক ফিকহ'র সেবা করে? [ما هي منهجية الإمام ابن رشد في كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"؟ وكيف يخدم هذا الكتاب الفقه المقارن؟]

প্রশ্ন-১৯: বর্তমান যুগে তুলনামূলক ফিকহে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনাকে সমৃদ্ধকরণে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান সাময়িকীগুলোর ভূমিকা আলোচনা কর। [ناقش دور الجامعات والمجلات العلمية في إثراء البحث والتأليف في الفقه المقارن في العصر الحاضر.]

প্রশ্ন-২০: তুলনামূলক ফিকহের গবেষকের শর্তাবলি কী কী? শুধু মাযহাবের মতামত জানা কি যথেষ্ট? [ما هي شروط الباحث في الفقه المقارن؟ وهل يكفي مجرد المعرفة بآراء المذاهب؟]

ফিকহী মাযহাবসমূহের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ

প্রশ্ন-২১: 'ফিকহী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ' কী? মুফতী ও গবেষকের জন্য তার গুরুত্ব কী? [ما هي "الكتب المعتمدة في المذاهب الفقهية"؟ وما هي أهميتها للمفتي والباحث؟]

প্রশ্ন-২২: চারটি মাযহাবের (যেমন হানাফী, মালেকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী) গুরুত্বপূর্ণ নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের উদাহরণ দাও। [اذكر أمثلة لأهم الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة (كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة).]

প্রশ্ন-২৩: প্রতিটি মাযহাবে নির্ভরযোগ্য মত (আল-কওলুল মু'তামাদ) কীভাবে নির্ধারণ করা হয়? এর মূলনীতি কী? [كيف يتم تحديد القول المعتمد في كل مذهب، وما هو الضابط في ذلك؟]

প্রশ্ন-২৪: 'ফিকহী মাযহাবের পরিভাষাসমূহ' কী কী? তুলনামূলক ফিকহে এগুলো জানার গুরুত্ব কী? [ما هي "مصطلحات المذاهب الفقهية"؟ وما أهمية معرفتها في الفقه المقارن؟]

প্রশ্ন-২৫: হানাফীদের নিকট 'আল-আসাহ' ও 'আর-রাজীহ' এবং শাফেয়ীদের নিকট 'আল-মুতামাদ' পরিভাষাগুলোর তাৎপর্য স্পষ্ট কর। [وضح دلالة المصطلحين "الأصح" و"الراجح" عند الحنفية و"المعتمد" عند الشافعية.]

প্রশ্ন-২৬: মালেকী মাযহাবে 'আল-মাশহুর' (প্রসিদ্ধ) এবং 'আল-মানসুস আলাইহি' (সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত) পরিভাষা দুটির মধ্যে পার্থক্য কী? [ما هو الفرق بين مصطلح "المشهور" و"المنصوص عليه" في المذهب المالكي؟]

প্রশ্ন-২৭: হানাফী মাযহাবে 'আলাইহিল আমাল' (যদনুসারে আমল করা হয়) বা 'আল্লাযী বিহিল ফতোয়া' (যা দিয়ে ফতোয়া দেওয়া হয়) পরিভাষাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। [اشرح دلالة مصطلح "عليه العمل" أو "الذي به الفتوى" في المذهب الحنفي.]

প্রশ্ন-২৮: ফিকহী পরিভাষাগুলো না জানা কীভাবে তুলনামূলক ফিকহে অগ্রাধিকার প্রদানের (তারজীহ) প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে? [كيف يؤثر عدم معرفة المصطلحات الفقهية على عملية الترجيح في الفقه المقارن؟]

প্রশ্ন-২৯: প্রতিটি মাযহাবে 'ফকীহদের স্তরসমূহ' কী কী? পরিভাষা বোঝা ও অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব কী? [ما هي "طبقات الفقهاء" عند كل مذهب؟ وما أهميتها في فهم المصطلحات والترجيح؟]

প্রশ্ন-৩০: 'ফিকহী মাযহাবের পরিভাষাসমূহ' বোঝা ও এগুলো দ্বারা দলীল পেশ করার ক্ষেত্রে 'ক্বাওয়ায়েদুল ফিকহ' (ফিকহী মূলনীতি)-এর গুরুত্ব আলোচনা কর। [ناقش أهمية "قواعد الفقه" في فهم "مصطلحات المذاهب الفقهية" والاستدلال بها.]

আল ফিকহ ওয়াল ফিকহুল মাযহাবী

প্রশ্ন-০১: ফিকহ-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। শরয়ী অন্যান্য ইলম থেকে একে আলাদা করার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

عرف الفقه لغة واصطلاحا، وما هي خصائصه التي تميزه عن غيره من (العلوم الشرعية؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানভাণ্ডারে 'ইলমুল ফিকহ' বা ফিকহ শাস্ত্রের স্থান অত্যন্ত উচ্চে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ শরীয়তসম্মত হচ্ছে কি না, তা জানার একমাত্র মাধ্যম হলো ফিকহ। কুরআন ও সুন্নাহর নির্যাস হলো এই শাস্ত্র। শরয়ী অন্যান্য ইলম (যেমন— আকাইদ, তাফসির) থেকে এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও কর্মপরিধি রয়েছে।

ফিকহ-এর সংজ্ঞা (تعريف الفقه):

১. আভিধানিক সংজ্ঞা (التعريف اللغوي): আরবি 'ফিকহ' (الْفِقْهُ) শব্দের মূল আভিধানিক অর্থ হলো 'গভীরভাবে অনুধাবন করা' বা 'বোঝা' (الْفَهْمُ)। কোনো বক্তার কথার উদ্দেশ্য এবং মর্ম গভীরভাবে উপলব্দি করাকে ফিকহ বলা হয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ(অর্থ: তারা বলল, হে শুয়াইব! তুমি যা বল তার অনেক কিছুই আমরা বুঝি না (নাফকাহু)। —সূরা হুদ: ৯১)

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): উসূলবিদ ও ফকীহগণের পরিভাষায় ফিকহের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হলো:

هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ(অর্থ: ফিকহ হলো বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ থেকে অর্জিত শরীয়তের আমল বা কাজ সম্পর্কিত বিধানাবলীর জ্ঞান।)

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সংজ্ঞা: ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহের ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন:

الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا(অর্থ: ফিকহ হলো নফসের (আত্মার) জন্য উপকারী ও ক্ষতিকর বিষয়গুলো জানা।) এই সংজ্ঞায় ঈমান, আমল ও

আখলাক—সবই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে পরবর্তী যুগে ফিকহ কেবল আমলী বিধানের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

অন্যান্য ইলম থেকে ফিকহকে পৃথক করার বৈশিষ্ট্যসমূহ (خصائص الفقه):

শরয়ী অন্যান্য ইলম (যেমন— ইলমুল কালাম বা আকাইদ, ইলমুল আখলাক বা তাসাউফ)-এর সাথে ফিকহের কিছু মৌলিক পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। নিচে তা আলোচনা করা হলো:

১. বিষয়বস্তুর ভিন্নতা (মওযু):

- **ইলমুল ফিকহ:** এর আলোচ্য বিষয় হলো 'বান্দার আমল বা কাজ' (শারীরিক ইবাদত ও লেনদেন)।
- **ইলমুল আকাইদ:** এর আলোচ্য বিষয় হলো 'বিশ্বাস' বা ঈমানী বিষয়।
- **ইলমুল আখলাক:** এর আলোচ্য বিষয় হলো 'অন্তর' ও তার গুণাবলী। সুতরাং, ফিকহ কেবল মানুষের বাহ্যিক কাজের হালাল-হারাম ও বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে আলোচনা করে।

২. বিধানের প্রকৃতি (তাবীয়াতুল আহকাম): ফিকহের বিধানগুলো হলো 'আমলী' বা ব্যবহারিক (Practical)। যেমন— নামাজ পড়া ফরজ, সুদ খাওয়া হারাম। পক্ষান্তরে, আকাইদের বিধান হলো তাত্ত্বিক বিশ্বাস। ফিকহ প্রমাণের দাবি রাখে, আর আকাইদ বিশ্বাসের দাবি রাখে।

৩. উৎসের ব্যবহার (ইস্তিম্বাত): ফিকহী মাসায়েল বের করা হয় 'তাফসিলী দলিল' (বিস্তারিত প্রমাণ) থেকে। অর্থাৎ কুরআনের নির্দিষ্ট আয়াত বা নির্দিষ্ট হাদিস থেকে যুক্তি ও কিয়াসের মাধ্যমে বিধান বের করা হয়। অন্যান্য ইলমে অনেক সময় সামগ্রিক ধারণা বা আকলি (বুদ্ধিবৃত্তিক) দলিলে জোর দেওয়া হয়।

৪. ইজতেহাদের সুযোগ: ফিকহের একটি বড় অংশ হলো 'যন্নী' (ধারণাপ্রসূত) বা ইজতেহাদী। অর্থাৎ মুজতাহিদগণের গবেষণার কারণে এতে মতভেদ হতে পারে এবং তা দোষণীয় নয়। কিন্তু আকাইদের মূল বিষয়গুলো অকাট্য (কাতয়ী), সেখানে ইজতেহাদ বা ভিন্নমতের সুযোগ নেই।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, ফিকহ হলো শরীয়তের ব্যবহারিক রূপ। মুসলমান হিসেবে জীবন পরিচালনার জন্য আকাইদের পরেই ফিকহের স্থান। এটি অন্যান্য শাস্ত্র থেকে পৃথক হয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সমাধান প্রদান করে, যা অন্য কোনো শাস্ত্র করে না।

প্রশ্ন-০২: ফিকহের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য (লক্ষ্য) কী? মুসলিম উম্মাহর জীবনে ফিকহের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট কর।

ما هو موضوع الفقه وغرضه (هدفه)؟ وضح أهمية الفقه وفضله في حياة الأمة المسلمة.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলাম কেবল কিছু বিশ্বাসের নাম নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এই জীবনব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার নামই হলো ফিকহ। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ফিকহের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য জানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি। কুরআন ও হাদিসে ফিকহ বা দ্বীনের গভীর জ্ঞানের অসামান্য ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

ফিকহের বিষয়বস্তু (موضوع الفقه): প্রতিটি বিজ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় থাকে। ফিকহের আলোচ্য বিষয় হলো:

فِعْلُ الْمُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ وَالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ(অর্থ: হালাল-হারাম, সহীহ-শুদ্ধ ও ফাসেদ বা বাতিল হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে মুকাল্লাফ বা শরীয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাজ।)

অর্থাৎ, একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ (মুকাল্লাফ) তার জীবনে যা কিছু করে— নামাজ, রোজা, ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ, তালাক, বিচার, অপরাধ ইত্যাদি— সবই ফিকহের বিষয়বস্তু।

ফিকহের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (غرض الفقه): ফিকহ শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য বা 'গারায' হলো দুটি: ১. **দুনিয়াবী সাফল্য:** মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে শৃঙ্খল এবং ইনসাফপূর্ণ করা। যাতে সমাজে শান্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ২. **পারলৌকিক মুক্তি:** আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী আমল করে পরকালে শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া এবং জান্নাত লাভ করা। সংক্ষেপে, "ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি" (الفوز بسعادة الدارين)।

মুসলিম উম্মাহর জীবনে ফিকহের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব (أهمية الفقه وفضله):

১. আল্লাহর কল্যাণ লাভ: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ফিকহ বা দ্বীনের বুঝ হলো আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের লক্ষণ। তিনি ইরশাদ করেন:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ(অর্থ: আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের ফিকহ (গভীর জ্ঞান) দান করেন। —বুখারী ও মুসলিম)

২. ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত: সঠিক ফিকহ ছাড়া ইবাদত কবুল হয় না। নামাজ কীভাবে পড়তে হবে, অজু কীভাবে করতে হবে—তা না জানলে সারাজীবন সিজদা করলেও নামাজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, "জ্ঞানার্জন করা নফল নামাজের চেয়ে উত্তম।"

৩. হালাল-হারাম পার্থক্যকরণ: একজন মুসলমানের জীবনে হালাল রুজি ও হারাম বর্জন অপরিহার্য। ফিকহ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, সুদ, ঘুষ ও অন্যায়ের পার্থক্য বোঝা অসম্ভব। ফিকহ মানুষকে হারামের অন্ধকার থেকে হালালের আলোয় নিয়ে আসে।

৪. সমাজ পরিচালনা ও বিচার ব্যবস্থা: ফিকহ কেবল ব্যক্তিগত আমল নয়, এটি রাষ্ট্র ও সমাজের আইন। অপরাধীর শাস্তি, সম্পদের বণ্টন (উত্তরাধিকার), এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—সবই ফিকহুল ইসলামীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। ফিকহবিহীন সমাজ হলো আইনবিহীন সমাজের মতো বিশৃঙ্খল।

৫. শয়তানের বিরুদ্ধে হাতিয়ার: হাদিসে এসেছে, "একজন ফকিহ (তত্ত্বজ্ঞানী আলেম) শয়তানের জন্য হাজার আবেদের (ইবাদতকারী) চেয়েও কঠোর।" কারণ ফকিহ শয়তানের ধোঁকা ও বিদআত বুঝতে পারেন, কিন্তু মূর্খ আবেদ সহজেই পথভ্রষ্ট হয়।

উপসংহার (خاتمة): ইলমুল ফিকহ হলো শরীয়তের মেরুদণ্ড। এটি ছাড়া ইসলাম পালন করা অসম্ভব। তাই মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ ফিকহ শিক্ষা করা 'ফরজে আইন' এবং সমাজের জন্য বিশেষজ্ঞ ফকিহ তৈরি করা 'ফরজে কিফায়া'।

প্রশ্ন-০৩: ফিকহের সেই অপরিহার্য বিষয়গুলো কী কী, যা ছাড়া কোনো মুসলমান তার ইবাদত ও মুআমালাত-এ চলতে পারে না?

ما هي ضروريات الفقه التي لا يستغني عنها المسلم في عباداته (ومعاملاته؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামে জ্ঞানার্জন করা ফরজ। তবে ফিকহের বিশাল সমুদ্রের সবটুকু জানা সবার জন্য ফরজ নয়। শরীয়ত প্রত্যেক মুসলমানের ওপর 'ফরজে আইন' হিসেবে ফিকহের কিছু অপরিহার্য বিষয় (Daruriyat) নির্ধারণ করে দিয়েছে। এগুলো না জানলে বান্দা গুনাহগার হবে এবং তার দৈনন্দিন জীবন শরীয়তসম্মত হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।"

অপরিহার্য ফিকহী বিষয়সমূহ (الضروريات الفقهية): আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) এবং অন্যান্য ফকিহগণের মতে, একজন মুসলমানের জন্য জীবনের প্রতিটি ধাপে সংশ্লিষ্ট বিধান জানা ওয়াজিব। এগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. আকাইদ ও ঈমান সংক্রান্ত জ্ঞান (علم العقائد): যদিও এটি সরাসরি ফিকহের পরিভাষায় পড়ে না, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একে 'আল-ফিকহুল আকবার' বলেছেন। একজন মুসলমানের জন্য সর্বপ্রথম অপরিহার্য হলো:

- আল্লাহর একত্ববাদ, সিফাত বা গুণাবলী জানা।
- রিসালাত, আখেরাত ও তাকদীরের সঠিক বিশ্বাস জানা।
- কুফর ও শিরক থেকে বাঁচার উপায় জানা।

২. ইবাদত সংক্রান্ত ফিকহ (فقه العبادات): প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে কিছু আমল ফরজ হয়ে যায়। এগুলোর নিয়মকানুন জানা ফরজে আইন।

- **তাহারাত (পবিত্রতা):** অজু, গোসল, এবং নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি। পানি না থাকলে তায়াম্মুমের নিয়ম।
- **সালাত (নামাজ):** নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত এবং নামাজ ভঙ্গের কারণসমূহ। কোন সময় নামাজ পড়া নিষিদ্ধ, তা জানা।

- **সাওম (রোজা):** রমজান মাসে রোজার নিয়ম, এবং কী করলে রোজা ভাঙ্গে তা জানা।
- **জাকাত ও হজ:** যার সম্পদ আছে, তার জন্য জাকাতের হিসাব জানা। যার সামর্থ্য আছে, তার জন্য হজের মাসায়েল জানা ফরজ।

৩. মুআমালাত ও লেনদেন সংক্রান্ত ফিকহ (فقه المعاملات): মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাকে জীবিকার জন্য কাজ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য ফিকহ হলো:

- **হালাল-হারাম উপার্জন:** ব্যবসায়ীকে ব্যবসার মাসায়েল, সুদের ভয়াবহতা এবং অবৈধ চুক্তির জ্ঞান রাখতে হবে। হযরত উমর (রা.) বলতেন, "যে আমাদের বাজারের (ব্যবসার) মাসায়েল জানে না, সে যেন আমাদের বাজারে ব্যবসা না করে।"
- **পারিবারিক জীবন:** বিয়ের আগে বিয়ের শর্ত ও মোহরানা সম্পর্কে জানা। স্বামী-স্ত্রীর হক এবং তালাকের মাসায়েল জানা, যাতে অজ্ঞতার কারণে সংসার ভেঙ্গে না যায় বা হারাম সম্পর্কে লিপ্ত না হয়।

৪. কলবের আমল বা আত্মশুদ্ধি: অহংকার, হিংসা, রিয়া (লৌকিকতা) ইত্যাদি হারাম। এগুলো থেকে বাঁচার ইলম জানাও অপরিহার্য ফিকহের অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ মূলনীতি (The General Rule): ফিকহী মূলনীতি হলো—

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ (অর্থ: যার মাধ্যমে ওয়াজিব আদায় সম্পন্ন হয়, তা অর্জন করাও ওয়াজিব।) অর্থাৎ, যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো নতুন অবস্থায় উপনীত হবে (যেমন— অসুস্থতা, সফর, বা নতুন ব্যবসা), তখন সেই অবস্থার শরয়ী হুকুম জেনে নেওয়া তার ওপর তাৎক্ষণিকভাবে ফরজ হয়ে যায়।

উপসংহার (خاتمة): একজন মুসলমান মুফতি বা মুজতাহিদ না হলেও তাকে অবশ্যই 'সচেতন মুসলিম' হতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের জন্য যেটুকু ফিকহ জানা প্রয়োজন, তা অর্জন করা ছাড়া পরকালীন মুক্তি অসম্ভব। এই নূন্যতম জ্ঞানই হলো ফিকহের অপরিহার্য বিষয়।

প্রশ্ন-০৪: 'আল-ফিকহুল মাযহাবী' (মাযহাবী ফিকহ)-এর সংজ্ঞা কী? যুগের পর যুগ ধরে এর উৎপত্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো কী কী?

ما تعريف "الفقه المذهبي"؟ وما هي العوامل التي أدت إلى نشأته وتعداده (عبر العصور؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তের ইতিহাসে 'আল-ফিকহুল মাযহাবী' বা মাযহাবী ফিকহ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং তৎপরবর্তী মুজতাহিদ ইমামগণের নিরলস প্রচেষ্টায় ফিকহ শাস্ত্র সুশৃঙ্খল রূপ লাভ করে। এই সুশৃঙ্খল এবং পদ্ধতিগত ফিকহ চর্চাই পরবর্তীতে মাযহাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মাযহাবী ফিকহ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও শৃঙ্খলার প্রতীক।

'আল-ফিকহুল মাযহাবী'-এর সংজ্ঞা (تعريف الفقه المذهبي):

১. আভিধানিক অর্থ: আরবি 'মাযহাব' (مَذْهَب) শব্দটি 'যাহাব' (ذَهَبَ) ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ যাওয়া বা গমন করা। আভিধানিক অর্থে মাযহাব মানে— চলার পথ, মত বা বিশ্বাস।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা: পরিভাষায় 'আল-ফিকহুল মাযহাবী' হলো:

মঝুয়াহ মিনাল আহকাম আশ-শারইয়্যাহ আল্লাতি ইস্তামবাতাহা ইমামু মুজতাহিদ মাখসুস। (অর্থ: সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে কোনো বিশেষ মুজতাহিদ ইমাম কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গবেষণা করে যে শরয়ী বিধানাবলী বের করেছেন এবং যা একটি স্বতন্ত্র স্কুল বা ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে মাযহাবী ফিকহ বলে।)

সহজ কথায়, নির্দিষ্ট উসূল বা মূলনীতির ভিত্তিতে গঠিত ফিকহী সম্প্রদায় বা ধারাকে মাযহাবী ফিকহ বলা হয়। যেমন— হানাফি ফিকহ, শাফেয়ী ফিকহ।

ফিকহুল মাযহাবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (النشأة والتطور):

ফিকহ কোনো একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এর ক্রমবিকাশকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা যায়: **১. নবুওয়াতের যুগ:** সরাসরি ওহীর মাধ্যমে বিধান আসত। **২. সাহাবা ও তাবেয়ীদের যুগ:** সাহাবীদের মধ্যে ব্যক্তিগত ইজতেহাদ ছিল, কিন্তু কোনো মাযহাব ছিল না। তবে কুফা (ইবনে মাসউদ রা.-এর অনুসারী) এবং মদিনা

(জায়েদ ইবনে সাবিত রা.-এর অনুসারী)—এই দুই ধারার সূচনা হয়। ৩. **তাদবীন বা সংকলন যুগ (২য়-৩য় হিজরি):** এই যুগে মুজতাহিদ ইমামগণ (যেমন— ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেয়ী, আহমদ) ফিকহকে কিতাব আকারে এবং নীতিমালার আলোকে সাজান। এখান থেকেই মাযহাবী ফিকহের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

মাযহাবের সংখ্যা বৃদ্ধি ও উৎপত্তির কারণসমূহ (أسباب التعدد والنشأة):

যুগের পর যুগ ধরে ফিকহী মাযহাব বা মতভেদের উৎপত্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে প্রধানত নিম্নোক্ত কারণগুলো দায়ী:

১. শরয়ী নস বা দলিলের প্রকৃতি (طبيعة النصوص): কুরআন ও হাদিসের অনেক শব্দ একাধিক অর্থবোধক (মুশতারাক)। যেমন— কুরআনে 'কুরু' (قرء) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ 'পবিত্রতা' আবার 'মাসিক' উভয়ই হতে পারে। এক ইমাম এক অর্থ নিয়েছেন, অন্যজন অন্য অর্থ। ফলে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব তৈরি হয়েছে।

২. হাদিস গ্রহণ ও বর্জনের নীতিমালা (اختلاف معايير قبول الحديث): হাদিস সহীহ হওয়ার শর্তাবলিতে ইমামদের মতভেদ ছিল।

- **হানাফি মাযহাব:** খবরে ওয়াহিদ (একক বর্ণনা) গ্রহণ করার জন্য শর্ত দেন যে, বর্ণনাকারী ফকিহ হতে হবে এবং হাদিসটি 'আমল বিল উমুম'-এর বিরোধী হতে পারবে না।
- **শাফেয়ী মাযহাব:** সনদ সহীহ হলেই তাঁরা হাদিস গ্রহণ করেন। এই নীতির পার্থক্যের কারণে ফিকহের ধারা ভিন্ন হয়েছে।

৩. ভৌগোলিক ও পরিবেশগত প্রভাব:

- **মদিনার ফিকহ (আহলুল হাদিস):** মদিনায় হাদিসের চর্চা বেশি ছিল, তাই ইমাম মালিক (রহ.) হাদিস ও মদিনাবাসীর আমলের ওপর ভিত্তি করে ফিকহ রচনা করেন।
- **কুফার ফিকহ (আহলুর রায়):** ইরাকের কুফায় নতুন নতুন সমস্যা বেশি ছিল এবং হাদিস কম পৌঁছাত। তাই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কিয়াস ও ইস্তিহসানের ওপর জোর দিয়ে ফিকহ রচনা করেন।

৪. উসূল বা মূলনীতির ভিন্নতা: কোন উৎসকে আগে প্রাধান্য দেওয়া হবে—তা নিয়ে ইমামদের মতভেদ ছিল। যেমন— ইমাম মালিক 'মাসালিহ মুরসালাহ' (জনকল্যাণ) এবং 'সাদ্দে যারাঈ' (অনিষ্টের পথ রোধ)-কে দলিল মানতেন, যা অন্যরা মানতেন না।

৫. ছাত্রদের ভূমিকা: যেসব ইমামের ছাত্ররা তাঁদের মতবাদ সংকলন ও প্রচার করেছেন, তাঁদের মাযহাব টিকে গেছে (যেমন— ৪ মাযহাব)। আর যাদের ছাত্ররা প্রচার করেনি (যেমন— ইমাম আওযায়ী, ইমাম লাইস), তাঁদের মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, ফিকহুল মাযহাবী কুরআন ও সুন্নাহরই ব্যাখ্যা। এই মতভেদ বা মাযহাবের বহুত্ব উম্মাহর জন্য বিভক্তি নয়, বরং রহমত ও প্রশস্ততা। সাহাবা ও তাবেয়ীদের যুগের ইজতেহাদী ভিন্নতাই পরবর্তীতে সুশৃঙ্খল মাযহাবী রূপ লাভ করেছে।

প্রশ্ন-০৫: চারটি ফিকহী মাযহাবের (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস-এর মতো) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিগুলো উল্লেখ কর। এই মূলনীতিগুলো ব্যবহারে প্রতিটি ইমামের পদ্ধতি আলোচনা কর।

(اذكر أهم أصول المذهب الفقهي الأربعة... وناقش منهج كل إمام في استخدام هذه الأصول.)

ভূমিকা (مقدمة): আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের চারটি প্রসিদ্ধ ফিকহী মাযহাব (হানাফি, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) শরীয়তের বিধান বের করার ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক উৎসের ওপর একমত। এগুলোকে 'আল-উসূলুল মুত্তাফাক আলাইহা' বলে। তবে এই উৎসগুলো ব্যবহারের পদ্ধতি ও ক্রমধারায় ইমামগণের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, যা ফিকহী ভিন্নতার জন্ম দিয়েছে।

চারটি সর্বসম্মত মূলনীতি (الأصول الأربعة المتفق عليها): সকল ইমামের মতে শরীয়তের প্রধান চারটি উৎস হলো: ১. **আল-কুরআন:** শরীয়তের প্রথম ও প্রধান উৎস। ২. **আস-সুন্নাহ:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ ও সমর্থন। ৩. **আল-ইজমা:** কোনো যুগে মুজতাহিদগণের একমত হওয়া। ৪. **আল-কিয়াস:** নতুন সমস্যার সাথে পুরোনো সমস্যার তুলনা করা।

মূলনীতি ব্যবহারে ইমামগণের পদ্ধতি ও মানহাজ (منهج الأئمة):

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পদ্ধতি (হানাফি মাযহাব): হানাফি মাযহাব 'ফিকহুর রায়' বা যুক্তিনির্ভর ফিকহ হিসেবে পরিচিত হলেও এর ভিত্তি কুরআন-সুন্নাহ। ইমামের পদ্ধতি হলো:

- **ক্রমধারা:** প্রথমে কুরআন, এরপর সুন্নাহ, এরপর সাহাবীদের ফতোয়া (যাঁরা ফকিহ ছিলেন), এরপর ইজমা এবং শেষে কিয়াস।
- **বিশেষত্ব:**
  - তিনি 'খবরে ওয়াহিদ' (একক হাদিস) দ্বারা কুরআনের 'আম' (ব্যাপক) বিধান বাতিল করেন না।
  - তিনি **'ইস্তিহসান'** (জনকল্যাণে কিয়াস বর্জন)-কে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন।
  - তিনি সাহাবীদের উক্তিকে নিজের ইজতেহাদের ওপর প্রাধান্য দেন, কিন্তু তাবেয়ীদের উক্তি মানতে বাধ্য নন।

২. ইমাম মালিক (রহ.)-এর পদ্ধতি (মালেকী মাযহাব): ইমাম মালিক মদিনার ইমাম। তাঁর পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো 'মদিনাবাসীর আমল'।

- **ক্রমধারা:** কুরআন, সুন্নাহ, **আমলু আহলিল মদিনা** (মদিনাবাসীর আমল), সাহাবীদের ফতোয়া, কিয়াস।
- **বিশেষত্ব:**
  - তিনি মদিনাবাসীর সম্মিলিত আমলকে 'খবরে ওয়াহিদ'-এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী মনে করতেন। কারণ এটি হাজার হাজার মানুষের ধারাবাহিক আমল (মুতাওয়াতির)।
  - তিনি **'মাসালিহ মুরসালাহ'** (জনস্বার্থ) এবং 'সাদ্দে যারাঈ' নীতি গ্রহণ করেন।

৩. ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর পদ্ধতি (শাফেয়ী মাযহাব): তিনি হানাফি ও মালেকী পদ্ধতির সমন্বয় করেছেন। তাঁর রচিত 'আর-রিসালা' উসূলে ফিকহের প্রথম কিতাব।

- **ক্রমধারা:** কুরআন ও সুন্নাহ (সমমর্যাদায়), ইজমা, এবং পরিশেষে কিয়াস।
- **বিশেষত্ব:**
  - তিনি 'ইস্তিহসান'-কে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, "যে ইস্তিহসান করল, সে যেন নতুন শরীয়ত বানাল।"
  - হাদিস সহীহ হলে তিনি তা নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করেন, মদিনাবাসীর আমল বা কিয়াসের কারণে হাদিস ছাড়েন না।
  - তিনি মুরসাল হাদিস (যে হাদিসে সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে) প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন না, যদিনা তা অন্য সনদে সমর্থিত হয়।

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর পদ্ধতি (হাম্বলী মাযহাব): তিনি মূলত মুহাদ্দিস ছিলেন, তাই তাঁর ফিকহে হাদিস ও আসার-এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

- **ক্রমধারা:** নস (কুরআন-সুন্নাহ), সাহাবীদের ফতোয়া, মুরসাল বা যঈফ (দুর্বল) হাদিস, এবং সর্বশেষ প্রয়োজনে কিয়াস।
- **বিশেষত্ব:**
  - তিনি **'যঈফ হাদিস'**-কে (যদি তা খুব বেশি দুর্বল না হয়) কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দেন।
  - কিয়াসের ব্যবহার তাঁর মাযহাবে সবচেয়ে কম। তিনি কেবল বাধ্য হলেই যুক্তির আশ্রয় নিতেন।

পার্থক্যসমূহের সারসংক্ষেপ (ছক):

বিষয়	হানাফি	মালেকী	শাফেয়ী	হাম্বলী
কিয়াস বনাম হাদিস	কিয়াসের ব্যাপক ব্যবহার (শর্তসাপেক্ষে)	মদিনার আমলকে হাদিসের ওপর প্রাধান্য	সহীহ হাদিসের ওপর অটল, ইস্তিহসান বাতিল	যঈফ হাদিসকেও কিয়াসের ওপর প্রাধান্য

বিশেষ উসূল	ইস্তিহসান	মাসালিহ মুরসালাহ	ইজমা ও কিয়াসে সীমাবদ্ধ	সাহাবীদের আসার

উপসংহার (خاتمة): সকল ইমামের লক্ষ্য ছিল আল্লাহর বিধানের সঠিক বাস্তবায়ন। পদ্ধতির ভিন্নতা থাকলেও মূল উৎসের ক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই একমত। হানাফি মাযহাব যুক্তি ও উপযোগিতার দিকে, আর হাম্বলী মাযহাব নস বা বর্ণনার দিকে বেশি ঝুঁকেছে—এটাই পদ্ধতির বৈচিত্র্য।

প্রশ্ন-০৬: প্রতিটি ইমামের ফিকহী পদ্ধতি কীভাবে বিধি-বিধান উদ্ভাবন এবং মাযহাবের ফিকহী মতামতের বৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব ফেলেছে?

كيف أثر المنهج الفقهي لكل إمام على استنباط الأحكام وتنوع الآراء الفقهية في المذهب؟)

ভূমিকা (مقدمة): উসূলে ফিকহ বা মূলনীতি হলো গাছের শিকড়, আর ফিকহী মাসায়েল হলো তার শাখা-প্রশাখা। শিকড় যেমন হবে, ফলও তেমন হবে। চার মাযহাবের ইমামগণের 'উসূল' বা ইজতেহাদের পদ্ধতি ভিন্ন হওয়ার কারণেই ফিকহী মাসায়েল বা 'ফুরু'-এর ক্ষেত্রে এত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রভাব বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কেন একই দলিলের ভিন্ন ভিন্ন আমল হয়।

বিধি-বিধান উদ্ভাবনে পদ্ধতির প্রভাব (أثر المنهج على الاستنباط):

১. হাদিস গ্রহণের শর্তের প্রভাব:

- **হানাফি পদ্ধতি:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর উসূল হলো, "খবরে ওয়াহিদ" বা একক বর্ণনা যদি কুরআনের সাধারণ (আম) আয়াতের বিরোধী হয়, তবে কুরআনের আয়াতই প্রাধান্য পাবে।
    - *ফলাফল:* নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া ইমাম আবু হানিফার মতে 'ওয়াজিব', 'ফরজ' নয়। কারণ কুরআনে বলা হয়েছে "কুরআন থেকে যা সহজ হয় পড়"। আর ফাতিহা পড়ার হাদিসটি খবরে ওয়াহিদ। তাই তিনি কুরআনের আয়াতে ফরজ এবং হাদিস দিয়ে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন।

- **শাফেয়ী পদ্ধতি:** ইমাম শাফেয়ীর মতে হাদিস সহীহ হলে তা কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হবে। তাই তাঁর মতে নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ।

২. মদিনাবাসীর আমলের প্রভাব:

- **মালেকী পদ্ধতি:** ইমাম মালিক (রহ.) মদিনাবাসীর আমলকে দলিল মানেন।
  - *ফলাফল:* মদিনাবাসীরা ওজনে কম-বেশি করে পণ্য বেচাকেনা করতেন না। কিন্তু হাদিসে আছে "ক্রেতা-বিক্রেতা মজলিস ত্যাগ না করা পর্যন্ত চুক্তি বাতিলের ইখতিয়ার রাখে" (খিয়ারুল মজলিস)। ইমাম মালিক মদিনার আমল দেখে এই হাদিসের বাহ্যিক আমল ত্যাগ করেছেন এবং খিয়ারুল মজলিস মানেন না। শাফেয়ীরা হাদিস মেনে এটি সাব্যস্ত করেন।

৩. ইস্তিহসান ও কিয়াসের প্রভাব:

- **হানাফি পদ্ধতি:** কোনো মাসআলায় সাধারণ কিয়াস প্রয়োগ করলে যদি মানুষের কষ্ট হয় বা অযৌক্তিক ফল আসে, তবে হানাফিরা 'ইস্তিহসান' বা সূক্ষ্ম কিয়াসের দিকে যান।
  - *ফলাফল:* এঁটো পানি দিয়ে অজু করা। কিয়াস বলে, বিড়াল যেহেতু হারাম প্রাণী, তার এঁটো নাপাক হওয়ার কথা। কিন্তু হানাফিরা ইস্তিহসানের ভিত্তিতে বলেন, বিড়াল ঘরে ঘুরে বেড়ায়, তাই এর এঁটো মাকরুহ হলেও পবিত্র (দুর্বল নয়)। শাফেয়ীরা এখানে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন।

৪. যঈফ হাদিসের প্রভাব:

- **হাম্বলী পদ্ধতি:** ইমাম আহমদ যঈফ হাদিসকে কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দেন।
  - *ফলাফল:* অজুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা। যঈফ হাদিসে এর গুরুত্ব এসেছে। অন্য ইমামরা একে সুন্নাত বা মুস্তাহাব বললেও, হাম্বলী মাযহাবে এটি অনেক ক্ষেত্রে ওয়াজিব বা শর্তের পর্যায়ে গুরুত্ব পায়।

মাযহাবী মতামতের বৈচিত্র্য (تنوع الآراء): পদ্ধতিগত এই পার্থক্যের কারণে ফিকহী মতামতে বিশাল বৈচিত্র্য এসেছে: **১. নমনীয়তা ও কঠোরতা:** হানাফি মাযহাবে ইস্তিহসান ও উরফের ব্যবহারের কারণে অনেক আধুনিক সমস্যার (যেমন— ওয়াকফ, মুআমালাত) সমাধান সহজ হয়েছে। অন্যদিকে হাম্বলী মাযহাব ইবাদতের ক্ষেত্রে হাদিসের ওপর অটল থাকায় অধিক সতর্কতা বজায় রেখেছে। **২. নতুন সমস্যার সমাধান (নাওয়াজিল):** মালেকী মাযহাবের 'মাসালিহ মুরসালাহ' (জনস্বার্থ) নীতি ব্যবহার করে রাষ্ট্র পরিচালনা ও জনকল্যাণমূলক অনেক নতুন আইন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যা কিয়াস-নির্ভর পদ্ধতিতে কঠিন ছিল।

উপসংহার (خاتمة): ইমামগণের ফিকহী পদ্ধতির এই ভিন্নতা কোনো বিরোধ নয়, বরং এটি শরীয়তের বিশালতা ও নমনীয়তার প্রমাণ। পদ্ধতির ভিন্নতার কারণেই আজ মুসলিম বিশ্ব বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে দ্বীন পালন করতে পারছে। হানাফি উসূলের কারণে আজম বা অনারব বিশ্বে ফিকহ সহজ হয়েছে, আর শাফেয়ী-হাম্বলী উসূলের কারণে নস বা হাদিসের সংরক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে।

আল ফিকহুল মুকারান (তুলনামূলক ফিকহ)

প্রশ্ন-০৭: 'আল-ফিকহুল মুকারান' (তুলনামূলক ফিকহ)-এর সংজ্ঞা দাও। উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির দিক থেকে আল-ফিকহুল মাযহাবী থেকে এর পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

(عرف "الفقه المقارن"، واشرح الفرق بينه وبين الفقه المذهبي في الغرض والمنهج.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানভাণ্ডারে 'আল-ফিকহুল মুকারান' বা তুলনামূলক ফিকহ একটি উচ্চতর গবেষণামূলক শাখা। এটি ফিকহী মাযহাবসমূহের অন্ধ অনুসরণ বা সংকীর্ণতা দূর করে দলীলের ভিত্তিতে সত্য অনুসন্ধানের পথ দেখায়। বর্তমান যুগে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য এবং নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য এই শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

ফিকহুল মুকারান-এর সংজ্ঞা (تعريف الفقه المقارن):

১. আভিধানিক অর্থ: 'মুকারান' (الْمُقَارَن) শব্দটি 'কারানা' (قَرَنَ) ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ একত্রিত করা বা তুলনা করা। আভিধানিক অর্থে একাধিক বস্তুর মধ্যে তুলনা করে শ্রেষ্ঠটি বেছে নেওয়াকে মুকারান বলে।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা: পরিভাষায় আল-ফিকহুল মুকারান হলো:

جَمْعُ الْآرَاءِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَالْمُوَازَنَةُ بَيْنَ أَدِلَّتِهَا لِبَيَانِ الرَّاجِحِ مِنْهَا (অর্থ: একই মাসআলায় ফকীহগণের বিভিন্ন মতামত একত্রিত করা এবং তাঁদের দলিলেগুলোর মধ্যে তুলনা (মুওয়াজানা) করে শক্তিশালী বা অগ্রাধিকারযোগ্য (রাজিহ) মতটি স্পষ্ট করা।)

সহজ কথায়, বিভিন্ন মাযহাবের মতামত ও দলিল সামনে রেখে নিরপেক্ষ পর্যালোচনার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর নামই ফিকহুল মুকারান।

উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির দিক থেকে ফিকহুল মাযহাবীর সাথে পার্থক্য (الفرق بينه وبين الفقه المذهبي):

যদিও উভয় শাস্ত্রের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ, তবুও তাদের লক্ষ্য ও পদ্ধতিতে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নিচে তা ছক আকারে তুলে ধরা হলো:

পার্থক্যের বিষয়	আল-ফিকহুল মাযহাবী (মাযহাবী ফিকহ)	আল-ফিকহুল মুকারান (তুলনামূলক ফিকহ)
১. সংজ্ঞা ও প্রকৃতি	একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের (যেমন— হানাফি) উসূল বা নীতি মেনে বিধান জানা ও মানা।	সকল মাযহাবের মতামত পর্যালোচনা করে দলীলের ভিত্তিতে শক্তিশালী মতটি গ্রহণ করা।
২. উদ্দেশ্য (الغرض)	নিজ মাযহাবের রায় বা সিদ্ধান্ত জানা এবং তার ওপর আমল করা। মাযহাবের মতকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করা।	সত্য বা হকের অনুসন্ধান করা, তা যে মাযহাবই হোক না কেন। সংকীর্ণতা দূর করে সঠিক সুন্নাহর অনুসরণ করা।
৩. পদ্ধতি (المنهج)	এখানে নির্দিষ্ট ইমামের উসূল বা নীতির অনুসরণ করা হয়। অন্য মাযহাবের দলিল দেখা জরুরি মনে করা হয় না।	এখানে 'মুওয়াজানা' বা তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণই প্রধান পদ্ধতি। গবেষক নিরপেক্ষভাবে সকল ইমামের দলিল যাচাই করেন।
৪. ফলাফল	এর মাধ্যমে 'মুকাল্লিদ' বা অনুসারী তৈরি হয়।	এর মাধ্যমে 'মুজতাহিদ' বা গবেষক তৈরি হয় এবং ইজতেহাদী যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
৫. দৃষ্টিভঙ্গি	নিজ মাযহাবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে।	এখানে পক্ষপাতিত্বের স্থান নেই, কেবল দলীলের শক্তি বিচার্য।

উপসংহার (خاتمة): আল-ফিকহুল মাযহাবী সাধারণ মানুষের জন্য অপরিহার্য, কারণ তাদের ইজতেহাদ করার যোগ্যতা নেই। কিন্তু আল-ফিকহুল মুকারান আলেম ও গবেষকদের জন্য জরুরি, যাতে তাঁরা গোঁড়ামি মুক্ত হয়ে শরীয়তের প্রকৃত ও শক্তিশালী রূপটি উম্মাহর সামনে তুলে ধরতে পারেন।

প্রশ্ন-০৮: আধুনিক যুগে একজন শিক্ষার্থীর জন্য তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের গুরুত্ব কী? এ অধ্যয়নের লক্ষ্য স্পষ্ট কর।

ما هي أهمية دراسة الفقه المقارن للطالب في العصر الحديث؟ وضح (الهدف من هذه الدراسة.)

ভূমিকা (مقدمة): বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। তথ্যপ্রযুক্তির কারণে মুসলিম বিশ্ব আজ একে অপরের খুব কাছাকাছি। এক দেশের মানুষ অন্য মাযহাবের মানুষের সাথে মিশছে। এমতাবস্থায় কেবল নিজের মাযহাবের জ্ঞান যথেষ্ট নয়। আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং উম্মাহর ফিকহী ঐক্য সাধনে 'ফিকহুল মুকারান' অধ্যয়ন করা সময়ের দাবি।

আধুনিক যুগে তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের গুরুত্ব (أهمية دراسة الفقه المقارن):

১. সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূরীকরণ: অনেক শিক্ষার্থী মনে করে কেবল তাদের মাযহাবই সঠিক এবং অন্যরা ভুলের ওপর আছে। ফিকহুল মুকারান অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, অন্য ইমামদের মতামতের পেছনেও শক্তিশালী দলিল রয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের মন উদার হয় এবং 'তাআসসুব' বা মাযহাবী গোঁড়ামি দূর হয়।

২. আধুনিক সমস্যার সমাধান (নাওয়াজিল): আধুনিক যুগে এমন অনেক সমস্যা (যেমন— শেয়ার বাজার, অঙ্গ প্রতিস্থাপন) তৈরি হয়েছে, যার সমাধান হয়তো একক কোনো মাযহাবে স্পষ্ট নেই বা কঠিন। তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়ন করলে গবেষক বিভিন্ন মাযহাবের উসূল মিলিয়ে সহজ ও যুগোপযোগী সমাধান বের করতে পারেন। একে 'তালফিক' বা সমন্বিত সমাধান বলা হয় (শর্তসাপেক্ষে)।

৩. ইজতেহাদী যোগ্যতা অর্জন: ফিকহুল মুকারান পাঠ করলে শিক্ষার্থী জানতে পারে কীভাবে মুজতাহিদগণ দলিল থেকে বিধান বের করেছেন। এই চর্চা শিক্ষার্থীর মধ্যে 'ফিকহী মেধা' (মালাকা) তৈরি করে, যা তাকে ভবিষ্যতে গবেষক হতে সাহায্য করে।

৪. উম্মাহর ঐক্য সাধন: মতভেদপূর্ণ মাসআলায় একে অপরকে কাফের বা ফাসেক বলা থেকে বিরত থাকা এবং "ইখতিলাফ বা মতভেদ উম্মাহর জন্য রহমত"—এই বোধ তৈরি করা ফিকহুল মুকারানের অন্যতম শিক্ষা। এটি মুসলিম ঐক্যের ভিত্তি।

অধ্যয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (أهداف الدراسة):

১. **সত্যের অনুসন্ধান:** কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুসরণ নয়, বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ ও সত্য বিধানটি খুঁজে বের করা। ২. **শরীয়তের নমনীয়তা প্রমাণ:** ইসলাম যে কোনো কঠিন ধর্ম নয় এবং এতে যে বিভিন্ন মতের অবকাশ (প্রশস্ততা) আছে, তা প্রমাণ করা। ৩. **মাযহাবগুলোর মধ্যে সম্প্রীতি:** ইমামগণের মধ্যে যে শ্রদ্ধাবোধ ছিল, তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করা। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) হানাফি ইমামদের সম্মান করতেন, এই শিক্ষাটি ছড়িয়ে দেওয়া।

উপসংহার (خاتمة): আধুনিক যুগের ফিতনা ও বিভক্তি থেকে বাঁচতে হলে ফিকহুল মুকারানের জ্ঞান অপরিহার্য। এটি শিক্ষার্থীকে অন্ধ অনুকরণ থেকে বের করে সচেতন অনুসরণের স্তরে উন্নীত করে এবং শরীয়তের মাকাসিদ বা উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-০৯: ইসলামের বিভিন্ন যুগে তুলনামূলক ফিকহের উৎপত্তি ও বিকাশ আলোচনা কর, এর প্রধান ধাপগুলো উল্লেখ কর।
(ناقش نشأة الفقه المقارن وتطوره في عصور الإسلام المختلفة، مع الإشارة إلى أهم المراحل التي مر بها.)

ভূমিকা (مقدمة): 'আল-ফিকহুল মুকারান' বা তুলনামূলক ফিকহ আধুনিক যুগে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে পরিচিতি পেলেও এর অস্তিত্ব ইসলামের শুরু থেকেই ছিল। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং মুজতাহিদ ইমামগণের যুগে এটি ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে চর্চা হয়েছে। ইতিহাসের ধারায় এর উৎপত্তি ও বিকাশকে প্রধানত চারটি ধাপে ভাগ করা যায়।

উৎপত্তি ও বিকাশের প্রধান ধাপসমূহ (مراحل النشأة والتطور):

প্রথম ধাপ: সাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগ (ইঙ্গিত ও সূচনা): রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর সাহাবীদের মধ্যে যখন কোনো নতুন মাসআলা আসত, তাঁরা একত্রিত হতেন। একজন রায় দিলে অন্যরা দলিল জানতে চাইতেন এবং দ্বিমত হলে দলিলের ভিত্তিতে আলোচনা (মুনাযারা) করতেন।

- **উদাহরণ:** হযরত উমর (রা.) ও ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মধ্যে ইদ্দত পালনকারী নারীর বাসস্থান ও ভরণপোষণ নিয়ে মতভেদ। তাঁরা একে অপরের দলিল যাচাই করতেন। এটিই ছিল তুলনামূলক ফিকহের প্রাথমিক রূপ।

দ্বিতীয় ধাপ: মুজতাহিদ ইমামগণের যুগ (স্বর্ণযুগ): হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে ফিকহী মাযহাবগুলো গঠিত হয়। এ সময় কুফার 'আহলুর রায়' (ইমাম আবু হানিফা) এবং মদিনার 'আহলুল হাদিস' (ইমাম মালিক)-এর মধ্যে ব্যাপক ফিকহী বিতর্ক হতো।

- **বিকাশ:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.) হানাফি ও মালেকী ফিকহের তুলনা করে 'আর-রিসালা' ও 'আল-উম্ম' রচনা করেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) 'ইখতিলাফু আবি হানিফা ওয়া ইবনি আবি লাইলা' নামে তুলনামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। এ যুগে তুলনা ছিল মৌখিক বিতর্ক ও খণ্ডনমূলক।

তৃতীয় ধাপ: মাযহাবী ফিকহ সংকলন ও তাখরীজ যুগ (মধ্যযুগ): চতুর্থ হিজরি থেকে মাযহাবগুলোর গোঁড়ামি কিছুটা বাড়ে, তবে জ্ঞানীরা তুলনামূলক ফিকহ ধরে রাখেন। এ যুগে 'ইখতিলাফুল ফুকাহা' (ফকিহদের মতভেদ) নামে স্বতন্ত্র কিতাব লেখা শুরু হয়।

- **উল্লেখযোগ্য কাজ:** ইমাম তাবারী (রহ.)-এর 'ইখতিলাফুল ফুকাহা', ইমাম তাহাবী (রহ.)-এর 'শারহু মাআনিল আসার' এবং ইবনে রুশদ (রহ.)-এর কালজয়ী গ্রন্থ **'বিদায়াতুল মুজতাহিদ'**। ইবনে রুশদ এই কিতাবে মতভেদের কারণ (আসবাবুল ইখতিলাফ) বিশ্লেষণ করে এই শাস্ত্রকে পূর্ণতা দান করেন।

চতুর্থ ধাপ: আধুনিক যুগ (প্রাতিষ্ঠানিক রূপ): বর্তমান যুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'ফিকহুল মুকারান' নামে আলাদা বিভাগ খোলা হয়েছে। ড. ওয়াহবা য উহাইলি, ড. আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ প্রমুখ আলেমগণ আধুনিক পদ্ধতিতে মাযহাবগুলোর তুলনা করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এখন এটি আর কেবল বিতর্কের বিষয় নয়, বরং এটি এখন আইন গবেষণার একটি বিজ্ঞান।

উপসংহার (خاتمة): তুলনামূলক ফিকহ সাহাবীদের যুগের সাদামাটা আলোচনা থেকে শুরু হয়ে ইমামদের যুগের বিতর্কের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে এবং মধ্যযুগে গ্রন্থাকারে রূপ লাভ করেছে। বর্তমানে এটি ইসলামী আইনশাস্ত্রের (Islamic Jurisprudence) অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত।

প্রশ্ন-১০: তুলনামূলক ফিকহে বিভিন্ন ইমামের মতামত ও তাদের দলীল অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রত্যাশিত উপকারিতাগুলো কী কী?

ما هي الفوائد المرجوة من دراسة آراء الأئمة المختلفة وأدلتهم في الفقه (المقارن؟)

ভূমিকা (مقدمة): 'আল-ফিকহুল মুকারান' বা তুলনামূলক ফিকহ কেবল বিভিন্ন মাযহাবের মতপার্থক্য জানার নাম নয়। বরং এটি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন এবং শরীয়তের সঠিক মর্ম অনুধাবনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। একজন গবেষক বা শিক্ষার্থীর জন্য ইমামগণের মতামত ও তাঁদের ব্যবহৃত দলীলসমূহ (আদিল্লা) অধ্যয়ন করার মধ্যে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বহুবিধ উপকারিতা নিহিত রয়েছে।

প্রত্যাশিত উপকারিতাসমূহ (الفوائد المرجوة):

১. সত্য বা হকের নিকটবর্তী হওয়া (إلى الحق والوصول): সব মুজতাহিদ সওয়াবের অধিকারী, কিন্তু সবার মত সবসময় সঠিক নাও হতে পারে। বিভিন্ন ইমামের দলীলগুলো পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে গবেষক বুঝতে পারেন কার দলীলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর প্রতিফলন বেশি ঘটেছে। এর মাধ্যমে 'রাজিহ' বা শক্তিশালী মত গ্রহণ করা সহজ হয়, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির কারণ।

২. ফিকহী সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূরীকরণ (إزالة التعصب المذهبي): যারা কেবল একটি মাযহাবের কিতাব পড়ে, তাদের অনেকের মধ্যে ধারণা জন্মে যে, "আমার ইমামই সঠিক এবং অন্যরা ভুলের ওপর আছেন।" কিন্তু যখন তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়ন করা হয়, তখন দেখা যায় যে, অন্য ইমামের মতামতের পেছনেও শক্তিশালী কুরআন-হাদীসের দলিল রয়েছে। এতে মাযহাবী গোঁড়ামি দূর হয় এবং অন্তরে অন্য ইমামদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়।

৩. ইজতেহাদী যোগ্যতা সৃষ্টি (تكوين الملكة الفقهية): ইমামগণের মতামত ও দলীলের প্রয়োগ পদ্ধতি (ইসতিম্বাত) নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে শিক্ষার্থীর মেধা শানিত হয়। সে বুঝতে পারে কীভাবে একটি আয়াত বা হাদীস থেকে বিভিন্ন হুকুম বের করা হয়েছে। এই চর্চা তার মধ্যে ভবিষ্যতে ইজতেহাদ করার বা নতুন সমস্যার সমাধান দেওয়ার যোগ্যতা (ফিকহী মালাকা) তৈরি করে।

৪. শরীয়তের প্রশস্ততা অনুধাবন (سعة الشريعة): বিভিন্ন মাযহাবের ভিন্ন ভিন্ন মত প্রমাণ করে যে, ইসলামী শরীয়ত সংকীর্ণ নয়। মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির জন্য এতে অবকাশ (রুখসত) রয়েছে। কোনো মাযহাবে কাঠিন্য (আজিমত) থাকলে, অন্য মাযহাবে হয়তো সহজতা (সহুলত) পাওয়া যায়। এই প্রশস্ততা জানা ফিকহুল মুকারানের অন্যতম উপকারিতা।

৫. মতভেদের কারণ জানা (معرفة أسباب الخلاف): কেন ইমামরা একমত হতে পারেননি—এই কারণগুলো জানা যায়। যেমন— কোনো হাদীস এক ইমামের কাছে পৌঁছেছে, অন্যের কাছে পৌঁছায়নি; অথবা শব্দের অর্থের ভিন্নতা। এই কারণগুলো জানলে ইমামদের প্রতি সুধারণা বজায় থাকে এবং বিভ্রান্তি দূর হয়।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়ন একজন ছাত্রকে 'মুকাল্লিদ' (অন্ধ অনুসারী) থেকে 'মুত্তাবি' (সচেতন অনুসারী) বা 'গবেষক'-এর স্তরে উন্নীত করে। এটি তাকে গোঁড়ামি মুক্ত, উদার এবং প্রজ্ঞাবান আলেম হিসেবে গড়ে তোলে।

প্রশ্ন-১১: বিগত যুগগুলোতে তুলনামূলক ফিকহ বিজ্ঞান বিকাশে অবদান রেখেছেন এমন প্রধান আলেমদের নাম উল্লেখ কর।
(اذكر أبرز العلماء الذين أسهموا في تطوير علم الفقه المقارن في العصور المتأخرة.)

ভূমিকা (مقدمة): 'আল-ফিকহুল মুকারান' বা তুলনামূলক ফিকহ শাস্ত্রটি একদিনে পূর্ণতা লাভ করেনি। সাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগের পর থেকে বিভিন্ন শতাব্দীতে মহান মনীষীগণ তাঁদের ক্ষুরধার লেখনী ও গবেষণার মাধ্যমে এই শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে হানাফি, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের প্রথিতযশা আলেমগণ এ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

বিকাশে অবদান রাখা প্রধান আলেমগণ (أبرز العلماء المساهمين):

ফিকহুল মুকারান বিকাশে অবদান রাখা আলেমদের সময়কালভেদে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) মধ্যযুগ বা ফিকহ সংকলনের স্বর্ণযুগের আলেমগণ:

১. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (রহ.) [মৃত্যু: ৩১০ হি.]: তিনি ছিলেন একাধারে মুফাসসির ও ফকিহ। তাঁর রচিত **'ইখতিলাফুল ফুকাহা'** গ্রন্থটি এই শাস্ত্রের অন্যতম আদি উৎস। এতে তিনি সাহাবা, তাবেয়ীন ও চার ইমামের মতভেদগুলো সংকলন করেছেন।

২. ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (রহ.) [মৃত্যু: ৩২১ হি.]: হানাফি মাযহাবের এই মহান ইমাম তুলনামূলক ফিকহে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'শারহু মাআনিল আসার'** এবং **'মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা'**-তে তিনি হানাফি মাযহাবের দলিলগুলো অন্যান্য মাযহাবের দলীলের সাথে তুলনা করে হানাফি মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

৩. ইমাম ইবনে রুশদ আল-হাফিদ (রহ.) [মৃত্যু: ৫৯৫ হি.]: তিনি ছিলেন মালেকী মাযহাবের ইমাম ও আন্দালুসিয়ার প্রধান বিচারপতি। তাঁর রচিত **'বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুক্তাসিদ'** গ্রন্থটিকে তুলনামূলক ফিকহের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ বা 'মাস্টারপিস' বলা হয়। এতে তিনি কেবল মতভেদ উল্লেখ করেননি, বরং মতভেদের কারণগুলো (আসবাবুল ইখতিলাফ) অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

৪. ইমাম ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী (রহ.) [মৃত্যু: ৬২০ হি.]: হাম্বলী মাযহাবের এই ইমাম রচিত **'আল-মুগনী'** গ্রন্থটি তুলনামূলক ফিকহের এক বিশাল ভাণ্ডার। এতে তিনি সাহাবা ও তাবেয়ীনসহ সকল মাযহাবের দলিল বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

(খ) পরবর্তী ও আধুনিক যুগের আলেমগণ:

১. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.): ভারতীয় উপমহাদেশের এই মহান সংস্কারক তাঁর **'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'** এবং **'আল-ইনসাফ ফি বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ'** গ্রন্থে মাযহাবগুলোর সমন্বয় এবং মতভেদের কারণ নিয়ে যুগান্তকারী আলোচনা করেছেন।

২. ড. ওয়াহবা আয-জুহাইলি (রহ.) [আধুনিক যুগ]: সিরিয়ার এই প্রখ্যাত ফকিহ **'আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু'** নামে ১১ খণ্ডের বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা আধুনিক যুগে তুলনামূলক ফিকহের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত সংকলন।

৩. **শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.):** তিনি হানাফি ফিকহ ও হাদীসের সমন্বয়ে তুলনামূলক গবেষণায় আধুনিক যুগে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

উপসংহার (خاتمة): এই মহান আলেমদের নিরলস প্রচেষ্টায় ফিকহুল মুকারান আজ একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ইমাম তাহাবী (রহ.) হানাফি মাযহাবকে এবং ইবনে রুশদ (রহ.) সামগ্রিক ফিকহকে দলীলের আলোকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত উম্মাহর পাথেয় হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন-১২: ফিকহী মাযহাবের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও তুলনামূলক ফিকহ কীভাবে ইসলামী উম্মাহর ঐক্যকে সেবা করে?
كيف يخدم الفقه المقارن وحدة الأمة الإسلامية على الرغم من تعدد المذاهب الفقهية؟)

ভূমিকা (مقدمة): আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ফিকহী মাযহাবের বহুত্ব এবং মতভেদ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের অন্তরায়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, 'ফিকহুল মুকারান' বা তুলনামূলক ফিকহ এই ভিন্নতাকেই ঐক্যের হাতিয়ারে পরিণত করে। এটি মতভেদকে 'বিভেদ' নয়, বরং 'রহমত' ও 'বৈচিত্র্য' হিসেবে উপস্থাপন করে উম্মাহকে এক সুতোয় গাঁথে।

ঐক্যের সেবায় তুলনামূলক ফিকহের ভূমিকা (دور الفقه المقارن في خدمة الوحدة):

১. মৌলিক ঐক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ: তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, ইমামদের মতভেদ কেবল শাখা-প্রশাখা (ফুরু) বা খুঁটিনাটি বিষয়ে। কিন্তু দ্বীনের মূল বিষয় (উসূল), আকীদা এবং মৌলিক ইবাদতে (যেমন— নামাজ ফরজ হওয়া, কাবামুখী হওয়া) সকল মাযহাব একমত। ফিকহুল মুকারান এই মৌলিক ঐক্যকে সামনে নিয়ে আসে এবং প্রমাণ করে যে, আমরা সবাই একই উৎসের (কুরআন-সুন্নাহ) অনুসারী।

২. ইমামদের একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রচার: তুলনামূলক ফিকহ আমাদের জানায় যে, ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং ইমাম আহমদ (রহ.) একে অপরকে কতটা শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেও একে অপরের পেছনে নামাজ পড়েছেন। এই ইতিহাস

জানার পর মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যকার হিংসা ও বিদ্বেষ দূর হয় এবং ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়।

৩. সংকটের সময় সমাধানের পথ (Rukhsah) বের করা: উম্মাহর ঐক্য রক্ষায় মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা জরুরি। ফিকহুল মুকারান দেখায় যে, কোনো মাসআলায় এক মাযহাবে কঠোরতা থাকলে, অন্য মাযহাবে সহজতা রয়েছে।

- **উদাহরণ:** হজের সময় ভিড়ের কারণে ওজু রক্ষা করা কঠিন হলে হানাফি বা শাফেয়ীরা মালেকী মাযহাবের সহজ মত গ্রহণ করতে পারেন। এই নমনীয়তা উম্মাহকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করে।

৪. সঠিক পন্থায় মতভেদ (আদাবুল ইখতিলাফ) শিক্ষা দেওয়া: মানুষের চিন্তাধারা এক হতে পারে না। ফিকহুল মুকারান শেখায় কীভাবে দলীলের ভিত্তিতে মার্জিতভাবে দ্বিমত পোষণ করতে হয়। একে অপরকে 'কাফের' বা 'ফাসেক' না বলে 'ইজতেহাদী ভুল' হিসেবে গণ্য করার মানসিকতা তৈরি করে, যা সামাজিক শান্তি ও ঐক্য বজায় রাখে।

৫. অভিন্ন আইনের দিকে অগ্রযাত্রা: আধুনিক যুগে মুসলিম দেশগুলো যখন আইন প্রণয়ন করে, তখন তুলনামূলক ফিকহের মাধ্যমে সব মাযহাবের নির্যাস নিয়ে একটি সর্বসম্মত বা অধিকাংশের গ্রহণযোগ্য আইন তৈরি করা সম্ভব হয়। এটিও ঐক্যের একটি বড় মাধ্যম।

উপসংহার (خاتمة): সুতরাং, মাযহাবের বহুত্ব কোনো দোষণীয় বিষয় নয়। ফিকহুল মুকারান এই বহুত্বকে বাগানের বিভিন্ন রঙের ফুলের মতো সাজিয়ে উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করে। এটি প্রমাণ করে যে, **"উম্মাহর ইখতিলাফ হলো রহমত"**। সংকীর্ণ দলাদলি থেকে বের করে এটি মুসলমানদেরকে 'এক উম্মাহ' হিসেবে চিন্তা করতে শেখায়।

তুলনামূলক ফিকহ গবেষণার পদ্ধতি

প্রশ্ন-১৩: 'তুলনামূলক ফিকহে গবেষণার পদ্ধতি কী? এর মৌলিক ধাপগুলো ক্রমানুসারে গণনা কর।

ما هي "طريقة البحث في الفقه المقارن"؟ وعدد خطواتها الأساسية (بتسلسل.)

ভূমিকা (مقدمة): 'আল-ফিকহুল মুকারান' বা তুলনামূলক ফিকহ কেবল মতভেদ জানার নাম নয়, বরং এটি একটি সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কোনো গবেষক যদি এলোমেলোভাবে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত উল্লেখ করেন, তবে তাকে ফিকহুল মুকারান বলা যায় না। সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য গবেষককে কিছু সুনির্দিষ্ট ধাপ বা 'মানহাজ' (منهج) অনুসরণ করতে হয়। এই পদ্ধতিটি সত্য উদঘাটন এবং মাযহাবী গোঁড়ামি দূরীকরণে অত্যন্ত কার্যকর।

তুলনামূলক ফিকহে গবেষণার পদ্ধতি (طريقة البحث في الفقه المقارن): তুলনামূলক ফিকহের গবেষণার পদ্ধতি হলো— একটি নির্দিষ্ট মাসআলা নির্বাচন করে তাতে ফকীহগণের মতামত, তাঁদের ব্যবহৃত দলিলসমূহ এবং সেগুলোর আলোচনা-সমালোচনা (মুনাক্বশা) নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করে অবশেষে শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে একটি মতকে অগ্রাধিকার (তারজীহ) দেওয়া।

গবেষণার মৌলিক ধাপসমূহ (الخطوات الأساسية للبحث): আধুনিক ও প্রাচীন গবেষকগণ ফিকহুল মুকারানের গবেষণার জন্য ধারাবাহিক ৫টি ধাপ নির্ধারণ করেছেন। সিলেবাস অনুযায়ী ধাপগুলো নিম্নরূপ:

১. মাসআলার চিত্রায়ন (تصوير المسألة - Taswir al-Mas'ala): সর্বপ্রথম আলোচ্য মাসআলাটি বা সমস্যাটি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। সমস্যাটি কী, এর স্বরূপ কী এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো কী কী—তা পাঠকের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা।

২. বিবাদের মূল জায়গা নির্ধারণ (تحرير محل النزاع - Tahriru Mahallin Niza): মাসআলাটির কোন অংশে সকল ইমাম একমত (ইজমা) এবং ঠিক কোন পয়েন্টে গিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ তৈরি হয়েছে, তা নির্দিষ্ট করা। যাতে অপ্রয়োজনীয় আলোচনা বাদ দিয়ে মূল বিরোধপূর্ণ স্থানে মনোযোগ দেওয়া যায়।

৩. মতবিরোধের কারণ বিশ্লেষণ (بيان منشأ الخلاف - Bayanu Mansha'il Khilaf): কেন ইমামগণের মধ্যে এই মতভেদ হলো—তার কারণ অনুসন্ধান করা। এটি কি কোনো শব্দের অর্থের ভিন্নতার কারণে, নাকি কোনো হাদিস গ্রহণ-বর্জনের নীতির কারণে হয়েছে, তা স্পষ্ট করা। ইবনে রুশদ (রহ.) এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ।

৪. আলেমগণের মতামত, দলিল উপস্থাপন ও পর্যালোচনা (عرض آراء العلماء وأدلتهم والمناقشة):

- প্রতিটি মাযহাবের মতামত তাদের নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে উদ্ধৃত করা।
- প্রতিটি মতের সপক্ষে কুরআন, সুন্নাহ বা কিয়াসের দলিল পেশ করা।
- দলিলগুলোর ওপর হওয়া আপত্তি ও জবাব (মুনাক্বশা) উল্লেখ করা।

৫. প্রাধান্য দেওয়া বা 'তারজিহ' (الترجيح - Tarjih): সবশেষে, দলিলের শক্তি বিবেচনা করে গবেষক কোনো একটি মতকে 'রাজিহ' (শক্তিশালী) ঘোষণা করবেন। এটিই গবেষণার চূড়ান্ত ফলাফল।

উপসংহার (خاتمة): এই ধারাবাহিক পদ্ধতি অনুসরণ করলেই কেবল একটি গবেষণা 'ফিকহুল মুকারান'-এর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়। এই পদ্ধতি গবেষককে আবেগ বা অন্ধ অনুকরণ থেকে মুক্ত করে দলীলের আলোয় সত্যের পথে পরিচালিত করে।

প্রশ্ন-১৪: তুলনামূলক গবেষণায় 'মাসআলার চিত্রায়ণ' অথবা 'বিরোধের স্থান নির্ধারণ ও স্পষ্টকরণ' ধাপটি ব্যাখ্যা কর।

(اشرح خطوة "تصوير المسألة" أو "تحديد وتحرير محل النزاع أو الخلاف" في البحث المقارن.)

ভূমিকা (مقدمة): তুলনামূলক ফিকহ গবেষণার ভিত্তি বা বুনিয়াদ হলো প্রথম দুটি ধাপ: 'মাসআলার চিত্রায়ণ' এবং 'বিরোধের স্থান নির্ধারণ'। কোনো ইমারত তৈরির আগে যেমন নকশা ও জমি নির্ধারণ জরুরি, তেমনি ফিকহী গবেষণায় সমাধানের আগে সমস্যাটি সঠিকভাবে বোঝা জরুরি। একটি প্রবাদ আছে, "কোনো কিছুর ধারণা লাভ করা তার সত্যায়নের পূর্বশর্ত।"

১. মাসআলার চিত্রায়ণ (تصوير المسألة):

সংজ্ঞা: 'তাসভীর' (تصوير) অর্থ ছবি আঁকা বা চিত্রায়ন করা। পরিভাষায়, গবেষণাধীন সমস্যাটির সংজ্ঞা, প্রকৃতি এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট এমনভাবে উপস্থাপন করা, যেন পাঠকের মানসপটে সমস্যাটির একটি স্পষ্ট ছবি ভেসে ওঠে।

গুরুত্ব ও পদ্ধতি:

- গবেষক মাসআলাটির পারিভাষিক অর্থ ও ব্যবহারিক রূপ তুলে ধরবেন।
- যদি বিষয়টি আধুনিক হয় (যেমন— বিটকয়েন বা টেস্ট টিউব বেবি), তবে তার বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা আগে দিতে হবে। কারণ, সমস্যা না বুঝলে সমাধান ভুল হবে।
- **উদাহরণ:** 'বীমা' (Insurance) হালাল না হারাম—তা গবেষণার আগে 'বীমা' কী, কীভাবে কাজ করে এবং এতে রিবা (সুদ) বা গারার (অনিশ্চয়তা) আছে কি না, তা স্পষ্ট করাই হলো 'তাসভীরুল মাসআলা'।

২. বিরোধের স্থান নির্ধারণ ও স্পষ্টকরণ (تحرير محل النزاع):

সংজ্ঞা: 'তাহরীর' (تحرير) অর্থ মুক্ত করা বা স্পষ্ট করা। 'মাহাল্লুন নিযা' (محل النزاع) অর্থ ঝগড়া বা বিরোধের জায়গা। অর্থাৎ, মাসআলার কোন অংশে ফকিহগণ একমত এবং কোন অংশে দ্বিমত পোষণ করেছেন, তা আলাদা করা।

গুরুত্ব ও পদ্ধতি: গবেষক তিনটি বিষয় স্পষ্ট করবেন:

১. **ঐকমত্যের স্থান (মাত্তাফাক আলাইহ):** মাসআলার যে অংশটুকুতে সব মাযহাব একমত। (যেমন— সুদ হারাম, এ বিষয়ে সবাই একমত)।

২. **ভিন্নমতের স্থান (মুখতালাফ ফিহ):** ঠিক কোন পয়েন্টে দ্বিমত আছে। (যেমন— ব্যাংকের সুদ কি কুরআনের রিবার অন্তর্ভুক্ত? এখানে আধুনিক কিছু মতভেদ থাকতে পারে)।

৩. **ফলশ্রুতি:** এতে আলোচনার পরিধি ছোট হয়ে আসে এবং গবেষক মূল পয়েন্টে ফোকাস করতে পারেন।

উদাহরণ: 'বিতর নামাজ' নিয়ে গবেষণায়:

- *ঐকমত্য:* বিতর পড়া শরীয়তে প্রমাণিত ও গুরুত্বপূর্ণ।
- *বিরোধের স্থান:* এটি কি 'ওয়াজিব' (হানাফি মত) নাকি 'সুন্নতে মুয়াক্কাদা' (অন্যদের মত)? গবেষক কেবল এই হুকুম নিয়েই আলোচনা করবেন।

উপসংহার (خاتمة): 'মাসআলার চিত্রায়ণ' গবেষককে অন্ধকারের হাতড়ানো থেকে বাঁচায় এবং 'বিরোধের স্থান নির্ধারণ' তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে। এই দুটি ধাপ ছাড়া গবেষণা অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর হতে বাধ্য।

প্রশ্ন-১৫: একজন গবেষক কীভাবে কোনো মতভেদপূর্ণ মাসয়ালায় 'আলেমগণের মতামত ও তাদের দলীলসমূহ বর্ণনা' করবেন? এবং সংশ্লিষ্ট সমালোচনাও 'গুরুত্ব' স্পষ্ট কর।

كيف يقوم الباحث بـ"بيان آراء العلماء وأدلتهم" في مسألة خلافية؟ وضح أهمية النقد الموضوعي.)

ভূমিকা (مقدمة): ফিকহুল মুকারান বা তুলনামূলক ফিকহের প্রাণ হলো 'দলীল ও মতামত উপস্থাপন'। গবেষকের সততা ও পাণ্ডিত্য এখানেই প্রকাশিত হয়। তিনি কীভাবে মাযহাবগুলোর মত উল্লেখ করছেন এবং কীভাবে সেগুলোর দলীল বিচার করছেন, তার ওপর ভিত্তি করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (তারজীহ) গৃহীত হয়।

আলেমগণের মতামত ও দলীল বর্ণনার পদ্ধতি (كيفية بيان الآراء والأدلة):

একজন গবেষক নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করবেন:

১. মতামত বিন্যাস (ترتيب الأقوال):

- গবেষক মতগুলোকে দল বা গ্রুপ আকারে সাজাবেন। যেমন— "প্রথম মত: যারা বৈধ বলেছেন (হানাফি ও মালেকী)", "দ্বিতীয় মত: যারা অবৈধ বলেছেন (শাফেয়ী ও হাম্বলী)"।
- মতামত অবশ্যই মূল সূত্র (Original Sources) থেকে নিতে হবে। হানাফি মত হানাফি কিতাব থেকে, শাফেয়ী মত শাফেয়ী কিতাব থেকে উদ্ধৃত করতে হবে। অন্যের কিতাব থেকে নকল করা যাবে না।

২. দলীল উপস্থাপন (سرد الأدلة): মতামত উল্লেখের পর প্রতিটি দলের দলীল পেশ করতে হবে। দলীলের ক্রমধারা হবে:

- প্রথমে কুরআন (আয়াত ও তার ব্যাখ্যা)।
- দ্বিতীয়ত সুন্নাহ (হাদিস ও তার সনদের মান)।
- তৃতীয়ত ইজমা, কিয়াস এবং আকলি (যৌক্তিক) দলিল। গবেষক দলীলগুলো এমনভাবে পেশ করবেন যেন মনে হয় তিনি সেই মতটিকেই সমর্থন করছেন। এটিই আমানতদারি।

সংশ্লিষ্ট সমালোচনা বা 'মুনাক্বশা'-এর গুরুত্ব (أهمية المناقشة والنقد):

দলীল উপস্থাপনের পরই আসে 'মুনাক্বশা' (المناقشة) বা পর্যালোচনা ও সমালোচনার ধাপ। এর গুরুত্ব অপরিসীম:

১. দলীলের শক্তি যাচাই: কেবল দলীল উল্লেখ করলেই হয় না, সেটি কতটুকু শক্তিশালী তা যাচাই করতে হয়। হাদিসটি কি 'সহীহ' না 'যঈফ'? আয়াতটি কি 'মানসুখ' (রহিত) হয়ে গেছে? এই সমালোচনা ছাড়া সত্য বের করা অসম্ভব।

২. আপত্তি ও জবাব (ই'তিরায ও জাওয়াব): বিপক্ষ দলের দলীলের ওপর কী কী আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে এবং তার জবাব কী দেওয়া হয়েছে—তা আলোচনা করা। যেমন— হানাফিরা শাফেয়ীদের হাদিসের ব্যাখ্যা কীভাবে দিয়েছেন, তা তুলে ধরা।

৩. নিরপেক্ষতা প্রমাণ: গঠনমূলক সমালোচনা (Constructive Criticism) প্রমাণ করে যে গবেষক কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধ ভক্ত নন, বরং তিনি দলীলের অনুসারী।

উপসংহার (خاتمة): সুতরাং, আলেমগণের মতামত ও দলীল বর্ণনার ক্ষেত্রে গবেষককে হতে হবে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী, আর সমালোচনার ক্ষেত্রে হতে হবে তীক্ষ্ণ বিচারক। এই ধাপটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হলেই কেবল একটি গ্রহণযোগ্য ও ইনসাফপূর্ণ সিদ্ধান্তে (তারজীহ) পৌঁছানো সম্ভব হয়।

প্রশ্ন-১৬: তুলনামূলক ফিকহে 'আলোচনা ও অগ্রাধিকার প্রদান (তারজীহ)'-এর মূলনীতিগুলো কী কী? গবেষক কীভাবে অগ্রাধিকারযোগ্য মতের কাছে পৌঁছাবেন?

ما هي ضوابط "المناقشة والترجيح" في الفقه المقارن؟ وكيف يصل (الباحث إلى القول الراجح؟)

ভূমিকা (مقدمة): তুলনামূলক ফিকহ গবেষণার সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো 'মুনাকেশা' (পর্যালোচনা) এবং 'তারজীহ' (অগ্রাধিকার প্রদান)। বিভিন্ন মাযহাবের মতামত ও দলিল একত্রিত করার পর গবেষক যদি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারেন, তবে সেই গবেষণার কোনো ফলাফল নেই। তারজীহ প্রদানের জন্য গবেষককে শরীয়ত নির্ধারিত কিছু সূক্ষ্ম মূলনীতি বা 'ধাওয়াবিত' অনুসরণ করতে হয়।

'মুনাকেশা ও তারজীহ'-এর মূলনীতিসমূহ (ضوابط المناقشة والترجيح):

একজন গবেষক খেয়ালখুশি মতো কোনো মতকে প্রাধান্য দিতে পারেন না। তাকে নিম্নোক্ত মানদণ্ডগুলো মেনে চলতে হয়:

১. দলীলের বিশুদ্ধতা ও শক্তি (صحة الدليل وقوته):

- যে মতের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট 'নস' (অকাট্য দলিল) আছে, তা কিয়াস বা যুক্তির ওপর প্রাধান্য পাবে।
- হাদীসের ক্ষেত্রে 'সহীহ' ও 'হাসান' হাদীস দ্বারা প্রমাণিত মতটি 'যঈফ' বা দুর্বল হাদীসের ওপর প্রাধান্য পাবে।
- যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা সূত্র) শক্তিশালী, তা দুর্বল সনদের ওপর অগ্রগণ্য হবে।

২. দলীলের নির্দেশনা বা দালালত (قوة الدلالة):

- যে দলীলের বক্তব্য স্পষ্ট (সরীহ), তা অস্পষ্ট বা ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্যের ওপর প্রাধান্য পাবে।
- 'খাস' (নির্দিষ্ট) নির্দেশ সাধারণত 'আম' (ব্যাপক) নির্দেশের ওপর প্রাধান্য পায় (হানাফি ও অধিকাংশ উসূলবিদদের মতে)।

৩. ফিকহী মূলনীতি ও মাকাসিদুশ শরীআহ (القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة):

- যে মতটি শরীয়তের সাধারণ উদ্দেশ্য বা মাকাসিদ (যেমন— দ্বীন, জান-মাল রক্ষা) এর সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা গ্রহণ করা হবে।
- যে মতটিতে মানুষের জন্য 'সহজতা' (তাইসীর) আছে এবং হারামের আশঙ্কা নেই, তা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেতে পারে।

গবেষক যেভাবে অগ্রাধিকারযোগ্য মতের কাছে পৌঁছাবেন (كيفية الوصول إلى القول الراجح):

তারজীহ প্রক্রিয়ায় গবেষক ক্রমানুসারে এই পদ্ধতি অবলম্বন করবেন:

১. **দলীলগুলোর তুলনা (মুওয়াজানা):** প্রথমে সব পক্ষের দলিলগুলো পাশাপাশি রাখবেন। ২. **দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ:** কোন দলীলে কী দুর্বলতা (যেমন— সনদে সমস্যা বা রহিত হয়ে যাওয়া) আছে, তা মুনাক্বশার মাধ্যমে বের করবেন। ৩. **সমন্বয় সাধন (আল-জামউ):** যদি সম্ভব হয়, উভয় মতের দলীলের মধ্যে সমন্বয় করবেন। যেমন— একটিকে 'ওয়াজিব' এবং অন্যটিকে 'মুস্তাহাব' বা বিশেষ অবস্থার জন্য প্রযোজ্য বলা। এটি বাতিলে চেয়ে উত্তম। ৪. **অগ্রাধিকার ঘোষণা:** যদি সমন্বয় সম্ভব না হয়, তবে শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে একটি মতকে 'রাজিহ' (শক্তিশালী) এবং অন্যটিকে 'মারজুহ' (দুর্বল) ঘোষণা করবেন।

উপসংহার (خاتمة): তারজীহের ক্ষেত্রে গবেষককে অবশ্যই মাযহাবী গোঁড়ামি ও প্রবৃত্তি পূজা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং দলীলের অনুসরণই হবে তার লক্ষ্য।

প্রশ্ন-১৭: প্রাচীন ও আধুনিক – উভয় সময়ের তুলনামূলক ফিকহে রচিত তিনটি প্রধান 'গ্রন্থাবলি' এবং তাদের লেখকদের নাম উল্লেখ কর।
(اذكر ثلاثة من أبرز "المؤلفات في الفقه المقارن" قديما وحديثا، مع ذكر مؤلفيها.)

ভূমিকা (مقدمة): ফিকহুল মুকারান বা তুলনামূলক ফিকহ শাস্ত্রটি দীর্ঘ ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রাচীন যুগের মুজতাহিদ ইমামগণ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের গবেষকগণ পর্যন্ত অনেকেই এ বিষয়ে কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থগুলোই ফিকহী গবেষণার প্রধান আকর বা উৎস।

প্রাচীন যুগের প্রধান গ্রন্থাবলি (المؤلفات القديمة):

মধ্যযুগ বা ফিকহ সংকলনের স্বর্ণযুগে যে কিতাবগুলো রচিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম তিনটি হলো:

১. ইখতিলাফুল ফুকাহা (اختلاف الفقهاء):

- **লেখক:** ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর **আত-তাবারী** (রহ.) [মৃত্যু: ৩১০ হি.]।
- **বৈশিষ্ট্য:** এটি এই শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলোর একটি। এতে তিনি সাহাবা, তাবেয়ীন ও মুজতাহিদ ইমামদের মতভেদগুলো সংকলন করেছেন।

২. শারহু মাআনিল আসার (شرح معاني الآثار):

- **লেখক:** ইমাম আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ **আত-তাহাবী** (রহ.) [মৃত্যু: ৩২১ হি.]।
- **বৈশিষ্ট্য:** হানাফি মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এটি একটি অনন্য কিতাব। তিনি হাদীসের আপাত বিরোধ নিষ্পত্তি করেছেন এবং ফিকহী মতভেদগুলো দলীলের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন।

৩. আল-মুগনী (المغني):

- **লেখক:** ইমাম মুওয়াফফাকুদ্দিন ইবনে কুদামা **আল-মাকদিসী** (রহ.) [মৃত্যু: ৬২০ হি.]।

- **বৈশিষ্ট্য:** হাম্বলী মাযহাবের এই বিশাল গ্রন্থটিকে তুলনামূলক ফিকহের বিশ্বকোষ বলা হয়। এতে প্রতিটি মাসআলায় সাহাবা ও ইমামদের দলিল বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

(উল্লেখ্য: সিলেবাসে ইবনে রুশদের 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ'-এর নামও গুরুত্বসহকারে আছে।)

আধুনিক যুগের প্রধান গ্রন্থাবলি (المؤلفات الحديثة):

বর্তমান যুগে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্রগুলোকে সামনে রেখে নতুন আঙ্গিকে যেসব কিতাব রচিত হয়েছে:

১. আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (الفقه الإسلامي وأدلته):

- **লেখক:** ড. ওয়াহবা **আয-জুহাইলি** (রহ.) [সিরিয়া]।
- **বৈশিষ্ট্য:** ১১ খণ্ডের এই বিশাল গ্রন্থটি আধুনিক যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বিস্তারিত সংকলন। এতে চার মাযহাবের পাশাপাশি আধুনিক মাসায়েলও আলোচিত হয়েছে।

২. আল-ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ (الفقه على المذاهب الأربعة):

- **লেখক:** শাইখ **আব্দুর রহমান আল-জাযিরী** (রহ.) [মিশর]।
- **বৈশিষ্ট্য:** এটি মূলত মিশরের আউকাফ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে রচিত। এতে চার মাযহাবের মাসায়েলগুলো খুব সহজ ভাষায় পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে, তবে দলীলের আলোচনা কম।

৩. ফিকহুল মুকারান (الفقه المقارن):

- **লেখক:** ড. **আব্দুল ফাত্তাহ কুববারাহ** (রহ.)

উপসংহার (خاتمة): প্রাচীন গ্রন্থগুলো গবেষণার গভীরতার জন্য এবং আধুনিক গ্রন্থগুলো বিন্যাস ও সহজবোধ্যতার জন্য বিখ্যাত। একজন গবেষকের জন্য উভয় যুগের কিতাবের সাথে সম্পর্ক রাখা জরুরি।

প্রশ্ন-১৮: ইমাম ইবনে রুশদ তাঁর 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুক্তাসিদ' কিতাবে কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন? এ কিতাবটি কীভাবে তুলনামূলক ফিকহ'র সেবা করে?

(ما هي منهجية الإمام ابن رشد في كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"؟ وكيف يخدم هذا الكتاب الفقه المقارن؟)

ভূমিকা (مقدمة): তুলনামূলক ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে আন্দালুসিয়ার প্রখ্যাত ফকিহ ও দার্শনিক আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে রুশদ আল-হাফিদ (রহ.) রচিত **'বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুক্তাসিদ'** একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। এটি কেবল মাসআলার সংকলন নয়, বরং ফিকহী গবেষণার এক অনন্য প্রশিক্ষণশালা। মালেকী মাযহাবের অনুসারী হয়েও তিনি এতে চরম নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে রুশদ-এর পদ্ধতি বা মানহাজ (منهجية الإمام ابن رشد):

ইমাম ইবনে রুশদ এই কিতাবে একটি স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন:

১. মতভেদ উল্লেখ (উদ্ধৃতি): তিনি প্রতিটি অধ্যায়ে প্রথমে সেই মাসায়েলগুলো উল্লেখ করেন যেগুলোতে ফকিহগণ একমত (ইজমা)। এরপর তিনি মতভেদপূর্ণ মাসায়েলগুলো উল্লেখ করেন এবং সাহাবা, তাবেয়ীন ও চার ইমামের কে কী বলেছেন, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন।

২. মতভেদের কারণ বিশ্লেষণ (বয়ানু আসবাবিল ইখতিলাফ): এটিই এই কিতাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি শুধু বলেন না যে "ইমাম আবু হানিফা এটি বলেছেন এবং শাফেয়ী ওটি বলেছেন"। বরং তিনি ব্যাখ্যা করেন **কেন** তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করলেন।

- কারণ হতে পারে কোনো হাদীস সহীহ হওয়া বা না হওয়া নিয়ে মতভেদ।
- অথবা আরবী ভাষার কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে ভিন্নতা।
- অথবা কিয়াসের পদ্ধতিগত পার্থক্য।

৩. উসূলের সাথে ফুরু-এর সমন্বয়: তিনি ফিকহী মাসআলাগুলোকে (ফুরু) সরাসরি উসূল বা মূলনীতির সাথে যুক্ত করে দেখান। এটি পাঠককে মুখস্থবিদ্যা থেকে বের করে গবেষণার গভীরে নিয়ে যায়।

কিতাবটি যেভাবে তুলনামূলক ফিকহের সেবা করে (خدمة الكتاب للفقه المقارن):

১. মুজতাহিদ তৈরির প্রশিক্ষণ: কিতাবটির নামের অর্থই হলো— "মুজতাহিদের সূচনা এবং গবেষকের তৃপ্তি"। এটি পাঠককে শেখায় কীভাবে দলিল থেকে বিধান বের করতে হয় এবং কীভাবে ইজতেহাদ করতে হয়। **২. ন্যায়বিচার ও ইনসাফ শিক্ষা:** ইবনে রুশদ অনেক ক্ষেত্রে নিজের মালেকী মাযহাবের মতের চেয়ে অন্য মাযহাবের মতকে শক্তিশালী প্রমাণ করেছেন। এটি গবেষকদের জন্য নিরপেক্ষতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। **৩. মতভেদের যৌক্তিকতা প্রমাণ:** এই কিতাব পড়লে বোঝা যায় যে, ইমামদের মতভেদ অযৌক্তিক নয়, বরং প্রতিটি মতের পেছনেই শক্তিশালী যুক্তি ও শরিয়তের ভিত্তি রয়েছে।

উপসংহার (خاتمة): 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' কিতাবটি তুলনামূলক ফিকহের গবেষকদের জন্য অপরিহার্য। এটি ফিকহকে কেবল 'ফতোয়া মুখস্থ' করার বিষয় থেকে 'গবেষণা ও অনুধাবন'-এর স্তরে উন্নীত করেছে।

প্রশ্ন-১৯: বর্তমান যুগে তুলনামূলক ফিকহে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনাকে সমৃদ্ধকরণে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান সাময়িকীগুলোর ভূমিকা আলোচনা কর।
(ناقش دور الجامعات والمجلات العلمية في إثراء البحث والتأليف في الفقه المقارن في العصر الحاضر.)

ভূমিকা (مقدمة): বর্তমান যুগে ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানচর্চা আর কেবল মসজিদ বা খানকাহ কেন্দ্রিক নেই; বরং তা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। বিশেষ করে 'আল-ফিকহুল মুকারান' বা তুলনামূলক ফিকহ শাস্ত্রটি আধুনিক যুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক কারিকুলাম এবং বিজ্ঞান সাময়িকীগুলোর (Scientific Journals) গবেষণার মাধ্যমে নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। মাযহাবী সংকীর্ণতা

দূর করে উম্মাহর ঐক্য এবং সমসাময়িক সমস্যার সমাধানে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা অপরিসীম।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা (دور الجامعات):

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, বিশেষ করে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং উপমহাদেশের কামিল ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তুলনামূলক ফিকহ চর্চায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

১. **স্বতন্ত্র বিভাগ ও কারিকুলাম প্রবর্তন:** পূর্বে ফিকহ শিক্ষা ছিল মূলত মাযহাবভিত্তিক। কিন্তু আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'কুল্লিয়াতুশ শরীআহ' বা শরীআহ অনুষদের অধীনে 'বিভাগীয় ফিকহুল মুকারান' চালু করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা কেবল নিজের মাযহাব নয়, বরং চার মাযহাবের দলিল ও মতামত নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছে। এটি তাদের চিন্তাজগৎকে প্রসারিত করছে।

২. **থিসিস ও উচ্চতর গবেষণা (রিসালাত বাওহুস):** এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে তুলনামূলক গবেষণাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যেমন— 'আধুনিক ব্যাংকিংয়ে চার মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি'। এই থিসিসগুলোর মাধ্যমে হাজার হাজার নতুন মাসআলার সমাধান বের হয়ে আসছে, যা আগে কিতাবে ছিল না।

৩. **তুলনামূলক ফিকহের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন:** বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও শায়খগণ প্রাচীন জটিল ইবারতগুলোকে সহজ করে আধুনিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করছেন। ড. ওয়াহবা জুহাইলি, ড. আব্দুল কারিম যায়েদান প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাই এই শাস্ত্রকে সহজ করে উম্মাহর সামনে তুলে ধরেছেন।

বিজ্ঞান সাময়িকী বা জার্নালগুলোর ভূমিকা (دور المجلات العلمية):

'আল-মাজাল্লাত আল-ইলমিয়্যাহ' বা পিয়ার-রিভিউড জার্নালগুলো ফিকহী গবেষণার মান নিয়ন্ত্রণে এবং প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১. **নাওয়াজিল বা নতুন সমস্যার সমাধান:** আধুনিক সমস্যা (যেমন— বিটকয়েন, টেস্ট টিউব বেবি, অঙ্গ প্রতিস্থাপন) নিয়ে বড় বড় কিতাব লেখার আগে জার্নালগুলোতে ছোট ছোট প্রবন্ধ (মাকালাত) প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন মাযহাবের

গবেষকরা সেখানে দলীলের আলোকে বিতর্ক করেন। যেমন— 'মাজাল্লাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী' (জেদ্দা) এক্ষেত্রে পথিকৃৎ।

২. **যৌথ ইজতেহাদের (ইজতেহাদে জামায়ি) প্ল্যাটফর্ম:** সাময়িকীগুলো একক কোনো মুফতির মতের ওপর নির্ভর না করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ফকিহদের মতামত প্রকাশ করে। এর ফলে একটি 'তুলনামূলক' ও 'সর্বসম্মত' সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সহজ হয়।

৩. **গবেষণার মান নিয়ন্ত্রণ:** এই সাময়িকীগুলোতে কোনো প্রবন্ধ ছাপানোর আগে বিশেষজ্ঞ আলেমদের দ্বারা যাচাই-বাছাই (তাহকিম) করা হয়। ফলে দুর্বল বা ভিত্তিহীন ফতোয়া প্রচারের সুযোগ কমে যায় এবং ফিকহুল মুকারানের বিশুদ্ধতা বজায় থাকে।

গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা সমৃদ্ধকরণে প্রভাব (الأثر في الإثراء):

বিশ্ববিদ্যালয় ও জার্নালগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে:

- ফিকহী গবেষণায় 'দলীল'-এর গুরুত্ব বেড়েছে এবং 'অন্ধ তাকলীদ' কমেছে।
- প্রাচীন ফিকহী কিতাবগুলোর নতুন সংস্করণ (তাহকিক) প্রকাশিত হচ্ছে, যেখানে তুলনামূলক টিকা সংযোজন করা হচ্ছে।
- আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাযহাবগুলোর দূরত্ব কমে আসছে।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, আধুনিক যুগে ফিকহুল মুকারানকে একটি জীবন্ত ও গতিশীল শাস্ত্রে পরিণত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান সাময়িকীগুলো। এগুলো প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক বাস্তবতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে ইসলামী আইনকে যুগোপযোগী করে তুলেছে।

প্রশ্ন-২০: তুলনামূলক ফিকহের গবেষকের শর্তাবলি কী কী? শুধু মাযহাবের মতামত জানা কি যথেষ্ট?

ما هي شروط الباحث في الفقه المقارن؟ وهل يكفي مجرد المعرفة بآراء المذاهب؟)

ভূমিকা (مقدمة): 'আল-ফিকহুল মুকারান' বা তুলনামূলক ফিকহে গবেষণা করা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এটি কেবল বই থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার নাম নয়, বরং এটি হলো মুজতাহিদ ইমামগণের মতামতের বিচার-বিশ্লেষণ করে সত্য উদঘাটন করা। তাই যে কেউ চাইলেই এ বিষয়ে কলম ধরতে পারেন না। একজন গবেষককে (আল-বাহিস) অবশ্যই শরীয়ত নির্ধারিত কিছু যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হয়।

তুলনামূলক ফিকহের গবেষকের শর্তাবলি (شروط الباحث في الفقه المقارن):

গবেষককে অবশ্যই 'মাকাসিদুশ শরীআহ' এবং 'উসূলে ফিকহ'-এর গভীর জ্ঞান রাখতে হবে। প্রধান শর্তগুলো হলো:

১. **ইখলাস ও নিরপেক্ষতা (Insaaf):** গবেষককে অবশ্যই মাযহাবী গোঁড়ামি (তাআসসুব) থেকে মুক্ত হতে হবে। গবেষণার আগেই "আমার মাযহাবই সঠিক" এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। তার লক্ষ্য হবে একমাত্র আল্লাহকে খুশি করা এবং দলীলের ভিত্তিতে সত্য বা হক কথাটি গ্রহণ করা, তা যে মাযহাবেরই হোক না কেন।

২. **শরয়ী উৎসসমূহের জ্ঞান (Ilm bil Masadir):** কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। বিশেষ করে 'আয়াতুল আহকাম' এবং 'আহাদিসুল আহকাম'-এর ওপর দখল থাকতে হবে। হাদিসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা (সহীহ-যঈফ) যাচাইয়ের যোগ্যতা থাকা জরুরি।

৩. **উসূলে ফিকহের দক্ষতা (Maharah fi Usul al-Fiqh):** এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। গবেষককে জানতে হবে— 'আম-খাস', 'নাসিখ-মানসুখ', 'মুতলাক-মুকাইয়্যদ' এবং 'কিয়াস'-এর নীতিমালা। কারণ, ইমামদের মতভেদ মূলত এই উসূলের ভিন্নতার কারণেই হয়েছে। উসূল না জানলে তিনি ইমামদের দলীলের মর্ম বুঝতে পারবেন না।

৪. **আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য (Ilm al-Lughah):** ফিকহী নস বা ইবারতগুলো আরবিতে। শব্দের সূক্ষ্ম অর্থ ও ব্যাকরণগত ভিন্নতার কারণে বিধানে পরিবর্তন আসে। তাই আরবি ভাষায় উচ্চতর দক্ষতা ছাড়া গবেষণা অসম্ভব।

৫. **মতভেদের কারণ সম্পর্কে জ্ঞান (Marifatu Asbab al-Ikhtilaf):** কেন ইমামরা ভিন্নমত পোষণ করলেন—সেই প্রেক্ষাপট ও কারণগুলো জানতে হবে। না হলে গবেষক ইমামদের প্রতি কুধারণা পোষণ করতে পারেন বা ভুল ব্যাখ্যা দিতে পারেন।

শুধু মাযহাবের মতামত জানা কি যথেষ্ট? (هل تكفي معرفة الآراء؟):

উত্তর: না, তুলনামূলক ফিকহ গবেষণার জন্য কেবল বিভিন্ন মাযহাবের মতামত (আকওয়াল) মুখস্থ থাকা বা জানা মোটেও যথেষ্ট নয়।

কারণ ও ব্যাখ্যা: ১. নকল বনাম গবেষণা: শুধু মতামত উল্লেখ করাকে বলা হয় 'নকল' (Copying), এটি 'মুকারান' বা তুলনা নয়। তুলনা করতে হলে মতামতের পেছনের **দলীল (Adillah)** এবং **যুক্তির ধরন (Wajh al-Istidlal)** জানতে হবে। ২. **তারজীহ প্রদান:** তুলনামূলক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো 'তারজীহ' বা একটি মতকে প্রাধান্য দেওয়া। কিন্তু গবেষক যদি কেবল জানেন যে, "হানাফিরা এটা বলেছেন আর শাফেয়ীরা ওটা বলেছেন", কিন্তু *কেন* বলেছেন তা না জানেন, তবে তিনি কীভাবে বুঝবেন কোনটি শক্তিশালী? ৩. **ভুল হওয়ার সম্ভাবনা:** অনেক সময় ফিকহী কিতাবে একটি মাযহাবের একাধিক মত থাকে। গবেষক যদি উসূল না জানেন, তবে তিনি মাযহাবের দুর্বল মতটি (মাজুহ) উল্লেখ করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারেন। নির্ভরযোগ্য মত (মুতামাদ) চেনার জন্য গবেষণার গভীরতা প্রয়োজন।

উপসংহার (خاتمة): তুলনামূলক ফিকহের গবেষক হতে হলে তাকে কেবল তথ্যের সংগ্রাহক হলে চলবে না, বরং তাকে হতে হবে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষক। ফিকহী মেধা (মালাকা) এবং দলীলের বিচার করার সক্ষমতাই তাকে একজন সফল গবেষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

ফিকহী মাযহাবসমূহের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ

প্রশ্ন-২১: 'ফিকহী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ' কী? মুফতী ও গবেষকের জন্য তার গুরুত্ব কী?

ما هي "الكتب المعتمدة في المذاهب الفقهية"؟ وما هي أهميتها للمفتي (والباحث؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহের সুদীর্ঘ ইতিহাসে হাজার হাজার কিতাব রচিত হয়েছে। কিন্তু সব কিতাব ফতোয়া বা গবেষণার জন্য সমানভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রতিটি মাযহাবে এমন কিছু নির্দিষ্ট কিতাব রয়েছে, যেগুলোকে সেই মাযহাবের 'ভিত্তি' বা 'দলিল' মনে করা হয়। এগুলোকে বলা হয় 'আল-কুতুবুল মুতামাদাহ' বা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। ফতোয়া প্রদানে ভুলের হাত থেকে বাঁচার জন্য এগুলো চিনে রাখা অপরিহার্য।

ফিকহী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ (الكتب المعتمدة في المذاهب):
নির্ভরযোগ্য কিতাব বলতে সেই সকল গ্রন্থকে বোঝায়, যা সংশ্লিষ্ট মাযহাবের মুজতাহিদ ইমামগণের সঠিক মতামত, দলীলের ভিত্তিতে যাচাইকৃত সিদ্ধান্ত (মুহাক্কাক মাসায়েল) এবং মাযহাবের স্বীকৃত নীতিমালার আলোকে রচিত হয়েছে।

মাযহাবভেদে নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদাহরণ:

- **হানাফি মাযহাব:** জাহিরুর রিওয়ায়া-এর ৬টি কিতাব (যেমন—মাবসুত), পরবর্তীতে হিদায়া, কানযুদ দাকায়িক, এবং ফতোয়ায়ে শামী (রদ্দুল মুহতার)।
- **শাফেয়ী মাযহাব:** ইমাম শাফেয়ীর 'আল-উম্ম', এবং পরবর্তী যুগের ইমাম নববীর 'মিনহাজুত তালেবীন'।
- **মালেকী মাযহাব:** আল-মুদাওয়ানা এবং মুখতাসার খলিল।
- **হাম্বলী মাযহাব:** ইবনে কুদামার আল-মুগনী এবং আল-ইকনা।

মুফতী ও গবেষকের জন্য এর গুরুত্ব (الأهمية للمفتي والباحث):
একজন মুফতী (যিনি ফতোয়া দেন) এবং একজন গবেষক (যিনি ফিকহুল মুকারান নিয়ে কাজ করেন) উভয়ের জন্য নির্ভরযোগ্য কিতাব চেনা ও ব্যবহার করা ফরজ পর্যায়ের জরুরি। এর গুরুত্ব নিম্নরূপ:

১. **মাযহাবের সঠিক মত উদ্ধৃত করা (Naml al-Madhhab):** একজন গবেষক যখন তুলনামূলক আলোচনা করবেন, তখন তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে তিনি যা বলছেন তা সত্যিই ওই ইমামের মত কি না। অ-নির্ভরযোগ্য কিতাবে অনেক সময় ইমামদের নামে ভুল বা দুর্বল মত চালানো হয়। নির্ভরযোগ্য কিতাব এই ভুলের হাত থেকে বাঁচায়।

২. **দুর্বল ও শক্তিশালী মতের পার্থক্যকরণ (Tamyiz):** নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোতে স্পষ্টভাবে বলা থাকে কোনটি 'মুতামাদ' (নির্ভরযোগ্য) মত আর কোনটি 'শায' (বিচ্ছিন্ন) বা 'জয়ীফ' (দুর্বল) মত। মুফতী যদি নির্ভরযোগ্য কিতাব না পড়েন, তবে তিনি দুর্বল মতের ওপর ফতোয়া দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারেন, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

৩. **তারজীহ বা প্রাধান্য প্রদানে সহায়তা:** ফিকহুল মুকারান গবেষণায় যখন দলীলের তুলনা করা হয়, তখন গবেষককে দেখতে হয় মাযহাবের শেষ সিদ্ধান্ত কী ছিল। নির্ভরযোগ্য কিতাব বিশেষ করে 'মুতুন' (মূলপাঠ) ও 'ফতোয়া'র কিতাবগুলো মাযহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (Settled Law) ধারণ করে।

৪. **ইজমা ও ইখতিলাফ জানা:** নির্ভরযোগ্য কিতাবে উল্লেখ থাকে কোন মাসআলায় ইমামরা একমত ছিলেন। গবেষক যদি সাধারণ কোনো চটি বই দেখে গবেষণা করেন, তবে তিনি ইজমা লঙ্ঘন করে ফেলতে পারেন।

৫. **বিচারকার্যে ও ফতোয়ায় দায়বদ্ধতা:** কাজী বা বিচারক যখন রায় দেন, তাকে নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতি দিতে হয়। একইভাবে মুফতী ফতোয়ায় যে কিতাবের হাওয়ালা দেবেন, তা মুতামাদ হতে হবে। আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, "অ-নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে ফতোয়া দেওয়া নাজায়েজ।"

উপসংহার (خاتمة): নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো হলো মাযহাবের বিশুদ্ধতার মানদণ্ড। ফিকহুল মুকারান বা ফতোয়া—উভয় ক্ষেত্রেই সত্য ও সঠিক বিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই কিতাবগুলোর ওপর নির্ভর করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন-২২: চারটি মাযহাবের (যেমন হানাফী, মালেকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী) গুরুত্বপূর্ণ নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ-এর উদাহরণ দাও।
اذكر أمثلة لأهم الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة: كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী ফিকহের ইতিহাসে মুজতাহিদ ইমামগণের ইন্তেকালের পর তাঁদের মাযহাব সংরক্ষণ, সংকলন ও বিন্যাসের দায়িত্ব পালন করেছেন পরবর্তী যুগের ফকিহগণ। হাজারো কিতাবের ভিড়ে প্রতিটি মাযহাবে এমন কিছু গ্রন্থ রয়েছে, যেগুলোকে ফতোয়া ও আমলের জন্য চূড়ান্ত ও 'নির্ভরযোগ্য' (আল-কুতুবুল মুতামাদাহ) হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। একজন গবেষকের জন্য এই কিতাবগুলো চেনা অপরিহার্য।

নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের উদাহরণ (أمثلة الكتب المعتمدة):

নিচে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের চারটি প্রসিদ্ধ মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

১. হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ (الكتب المعتمدة عند الحنفية):
হানাফি মাযহাবের কিতাবগুলোকে প্রধানত তিন স্তরে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে ফতোয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

- **যাহিরুর রিওয়ায়া (ظاهر الرواية):** ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী (রহ.) রচিত ৬টি কিতাব। এগুলোকে 'আল-উসূল' বলা হয়। যেমন— 'আল-মাবসুত' (المبسوط), 'আল-জামিউস সগীর' (الجامع الصغير), 'আল-জামিউল কাবীর' (الجامع الكبير)। এগুলো মাযহাবের ভিত্তি।

- **আল-হিদায়া (الهداية):** বুরহান উদ্দিন আল-মারগীনানী (রহ.) রচিত এই কিতাবটি হানাফি ফিকহের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ টেক্সট। এতে হানাফি মাযহাবের দলিলগুলো যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

- **ফতোয়ায়ে শামী বা রদ্দুল মুহতার (رد المحتار):** আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) রচিত 'দুররে মুখতার'-এর এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি

পরবর্তী যুগের ফতোয়ার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দানকারী গ্রন্থ। বর্তমান বিশ্বে হানাফি ফতোয়া মূলত এর ওপরই নির্ভরশীল।

- **বাদায়েউস সানায়ে (بدائع الصنائع):** ইমাম কাসানী (রহ.) রচিত এই কিতাবটিকে 'ফিকহী কিতাবসমূহের রাজটিকা' বলা হয় এর বিন্যাস ও দলীলের জন্য।

২. মালেকী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ (الكتب المعتمدة عند المالكية): ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাব মদিনাকেন্দ্রিক। তাঁদের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো হলো:

- **আল-মুদাওয়ানা আল-কুবরা (المدونة الكبرى):** ইমাম সাহনুন (রহ.) কর্তৃক সংকলিত। এতে ইমাম মালিক (রহ.)-এর ফতোয়াগুলো প্রশ্ন-উত্তর আকারে আছে। মালেকী মাযহাবে এটি হানাফিদের 'মাবসুত'-এর মতো মর্যাদা রাখে।

- **মুখতাসার খলিল (مختصر خليل):** শাইখ খলিল ইবনে ইসহাক আল-জুনদী (রহ.) রচিত। পরবর্তী মালেকী ফকিহদের নিকট ফতোয়া প্রদানের জন্য এটিই প্রধান আকরগ্রন্থ। মালেকী বিশ্বে প্রবাদ আছে, "খলিলে যা আছে, তাই মাযহাব।"

৩. শাফেয়ী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ (الكتب المعتمدة عند الشافعية): ইমাম শাফেয়ী (রহ.) নিজেই তাঁর কিতাব লিখে গেছেন।

- **আল-উম্ম (الأم):** ইমাম শাফেয়ী (রহ.) রচিত এই কিতাবটি শাফেয়ী মাযহাবের মূল উৎস। এতে তিনি ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের সাথে মতভেদগুলো দলীলের আলোকে আলোচনা করেছেন।

- **মিনহাজুত তালেবীন (منهاج الطالبين):** ইমাম নববী (রহ.) রচিত। শাফেয়ী মাযহাবে ফতোয়া প্রদানের জন্য এটি অন্যতম নির্ভরযোগ্য মতন (মূলপাঠ)।

- **তুহফাতুল মুহতাজ (تحفة المحتاج):** ইবনে হাজার হাইতামী (রহ.) রচিত 'মিনহাজ'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। মিসর ও ইয়েমেনের শাফেয়ীদের কাছে এটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য।

৪. হাম্বলী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ (الكتب المعتمدة عند الحنابلة): ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মাসায়েলগুলো তাঁর ছাত্ররা সংরক্ষণ করেছেন।

- **আল-মুগনী (المغني):** ইমাম ইবনে কুদামা আল-মাকদিসী (রহ.) রচিত। এটিকে হাম্বলী মাযহাবের বিশ্বকোষ বলা হয়। এটি একই সাথে মাযহাবী ও তুলনামূলক ফিকহের কিতাব।
- **আল-ইকনা (الإقناع):** মুসা আল-হাজ্জাবী (রহ.) রচিত। পরবর্তী যুগের হাম্বলীদের নিকট ফতোয়ার জন্য এটি নির্ভরযোগ্য।
- **মুনতাহাল ইরাদাত (منتهى الإرادات):** ইবনে নাজ্জার আল-ফুতুহী রচিত। হাম্বলী মাযহাবে বিচারকার্য ও ফতোয়ায় এটি চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

উপসংহার (خاتمة): গবেষক বা মুফতির জন্য এই কিতাবগুলোর নাম ও মর্যাদা জানা অপরিহার্য। হানাফি মাযহাবের গবেষক যেমন 'ফতোয়ায়ে শামী' ছাড়া চলতে পারেন না, তেমনি তুলনামূলক ফিকহের গবেষককে অন্য মাযহাবের 'আল-মুগনী' বা 'আল-উম্ম'-এর মতো মৌলিক কিতাবগুলো অধ্যয়ন করতে হয়।

প্রশ্ন-২৩: প্রতিটি মাযহাবে নির্ভরযোগ্য মত (আল-কওলুল মু'তামাদ) কীভাবে নির্ধারণ করা হয়? এর মূলনীতি কী?

(كيف يتم تحديد القول المعتمد في كل مذهب، وما هو الضابط في ذلك؟)

ভূমিকা (مقدمة): ফিকহী কিতাবগুলোতে একটি মাসআলায় ইমামগণের একাধিক উক্তি (আকওয়াল) পাওয়া যেতে পারে। এর মধ্য থেকে ফতোয়া ও আমলের জন্য যে উক্তিটিকে চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তাকে 'আল-কওলুল মু'তামাদ' (নির্ভরযোগ্য মত) বা 'মুফতা বিহি' (ফতোয়াযোগ্য মত) বলা হয়। প্রতিটি মাযহাবে এই নির্ভরযোগ্য মত নির্ধারণের নিজস্ব মানদণ্ড ও মূলনীতি রয়েছে।

নির্ভরযোগ্য মত নির্ধারণের মূলনীতি (ضوابط تحديد القول المعتمد):

সাধারণভাবে সকল মাযহাবে নির্ভরযোগ্য মত নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় দেখা হয়: ১. **দলীলের প্রবলতা:** কুরআন-সুন্নাহর দলীল যে পক্ষে শক্তিশালী। ২.

ইমামের সর্বশেষ মত: ইমাম যদি আগের মত থেকে 'রুজ্জু' (প্রত্যাবর্তন) করেন, তবে শেষ মতটিই ধর্তব্য। ৩. **অধিকাংশ ফকিহদের গ্রহণ:** মাযহাবের জমহুর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম যে মত গ্রহণ করেছেন।

তবে মাযহাবভেদে এর বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে:

১. হানাফি মাযহাবে নির্ভরযোগ্য মত নির্ধারণ পদ্ধতি: হানাফি মাযহাবে মত নির্বাচনের স্তরবিন্যাস অত্যন্ত সুশৃঙ্খল:

- **প্রথমত: যাহিরুর রিওয়ায়া (ظاهر الرواية):** ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর উসূলের কিতাবগুলোতে যে মতটি বর্ণিত আছে, সেটিই মাযহাবের মূল মত। যদি 'নাওয়াদির' (বিরল বর্ণনা)-এর সাথে বিরোধ হয়, তবে যাহিরুর রিওয়ায়া অগ্রাধিকার পাবে।

- **দ্বিতীয়ত: শাইখাইনের মত:** সাধারণত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তবে বিচারকার্য (ক্বাযা) ও সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মত গ্রহণ করা হয়। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বা মিরাসের ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মত প্রাধান্য পায়।

- **তৃতীয়ত: পরবর্তী ফকিহদের তারজীহ:** যদি ইমামদের একাধিক মত থাকে এবং মুতাকাদ্দিমীনগণ কোনো ফয়সালা না দেন, তবে আল্লামা শামী বা ইবনে নুজাইমের মতো পরবর্তী মুহাক্কিকগণ 'উরফ' ও 'জরুরত'-এর আলোকে যেটিকে 'ফতোয়া' বা 'সহীহ' বলেছেন, সেটিই মুতামাদ।

২. মালেকী মাযহাবে নির্ধারণ পদ্ধতি:

- ইমাম মালিক (রহ.)-এর অনেক বর্ণনা রয়েছে। এর মধ্যে যে বর্ণনাটি ইবনে কাসিম (রহ.) তাঁর 'মুদাওয়ানা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সেটিই সবচেয়ে শক্তিশালী।

- মালেকী পরিভাষায় 'মাশহুর' (প্রসিদ্ধ) মত এবং 'রাজিহ' (শক্তিশালী) মতের মধ্যে পার্থক্য আছে। ফতোয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত 'মাশহুর' মতের ওপর আমল করা হয়, যা অধিকাংশ মালেকী ফকিহ গ্রহণ করেছেন।

৩. শাফেয়ী মাযহাবে নির্ধারণ পদ্ধতি:

- ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর 'কওল কাদীম' (পুরাতন মত-ইরাক) এবং 'কওল জাদীদ' (নতুন মত-মিসর)-এর মধ্যে বিরোধ হলে, সর্বাবস্থায় **'কওল জাদীদ'** নির্ভরযোগ্য। (ব্যতিক্রম মাত্র ১৫-২০টি মাসআলা)।
- পরবর্তী যুগে নির্ভরযোগ্য মত নির্ধারণে **'শাইখাইন'** (ইমাম নববী ও ইমাম রাফেয়ী)-এর ঐকমত্য চূড়ান্ত। যদি তাঁদের মতভেদ হয়, তবে ইমাম নববী (রহ.)-এর মত অগ্রাধিকার পায়।

৪. হাম্বলী মাযহাবে নির্ধারণ পদ্ধতি:

- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর বক্তব্য (নস) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
- যদি ইমামের বক্তব্যে অস্পষ্টতা থাকে, তবে তাঁর ছাত্ররা (আসহাবুল উজুহ) যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার মধ্যে যেটি দলিলের দিক থেকে শক্তিশালী, সেটি গ্রহণ করা হয়।
- পরবর্তী যুগে আল-মারদাওয়ী বা ইবনে কুদামার তাহকিক বা গবেষণাকে নির্ভরযোগ্য মানা হয়।

উপসংহার (خاتمة): নির্ভরযোগ্য মত নির্ধারণের এই পদ্ধতি জানা মুফতির জন্য ফরজে আইন। কারণ, মুতামাদ মত ছেড়ে 'শায' বা দুর্বল মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া হারাম। এই নীতিমালাই মাযহাবকে বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করে সুশৃঙ্খল আইনি কাঠামোতে রূপ দিয়েছে।

প্রশ্ন-২৪: 'ফিকহী মাযহাবের পরিভাষাসমূহ' কী কী? তুলনামূলক ফিকহে এগুলো জানার গুরুত্ব কী?

ما هي "مصطلحات المذاهب الفقهية"؟ وما أهمية معرفتها في الفقه (المقارن؟)

ভূমিকা (مقدمة): প্রতিটি বিজ্ঞানের নিজস্ব ভাষা ও পরিভাষা (Terminology) থাকে। ফিকহ শাস্ত্র এবং এর বিভিন্ন মাযহাবের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। ফকিহগণ দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার না করে বিশেষ কিছু শব্দ বা সংকেত ব্যবহার করেছেন, যা দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থ, ব্যক্তি বা কিতাব বোঝানো হয়। এই

পরিভাষাগুলো না জানলে ফিকহী কিতাব অধ্যয়ন করা এবং সঠিক বিধান বের করা অসম্ভব।

ফিকহী মাযহাবের পরিভাষাসমূহ (مصطلحات المذاهب الفقهية):

মাযহাবের পরিভাষাগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. বিধান ও প্রাধান্য নির্দেশক পরিভাষা (Terms of Ruling & Preference): এই শব্দগুলো দ্বারা বোঝা যায় মাসআলাটি কতটা শক্তিশালী বা এর হুকুম কী।

- **হানাফি:**
  - **ফরজ ও ওয়াজিব:** অকাট্য দলিলে প্রমাণিত হলে 'ফরজ', আর প্রবল দলিলে প্রমাণিত হলে 'ওয়াজিব'। (অন্য মাযহাবে সাধারণত দুটি একই)।
  - **আসাহ ও সহীহ:** দুটিই শুদ্ধ মত, তবে 'আসাহ' (অধিকতর শুদ্ধ) মতটি 'সহীহ'-এর চেয়ে শক্তিশালী। ফতোয়া আসাহ-এর ওপর হবে।
- **শাফেয়ী:**
  - **আল-আযহার (الأظهر):** যখন ইমাম শাফেয়ীর দুটি মতের মধ্যে মতভেদ প্রবল হয়, তখন শক্তিশালীটিকে 'আযহার' বলা হয়।
  - **আল-মুতামাদ:** ফতোয়ার জন্য গৃহীত চূড়ান্ত মত।

২. ইমাম ও ফকিহদের নির্দেশক পরিভাষা (Terms Identifying Scholars):

- **আশ-শাইখান (الشيخان):** হানাফি মতে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ। কিন্তু শাফেয়ী মতে ইমাম নববী ও রাফেয়ী।
- **আশ-শাইখ:** হানাফি কিতাবে সাধারণত ইবনে হুমাম বা শামীকে বোঝায়, কিন্তু সাধারণ ফিকহে শাইখুল ইসলাম বা অন্য কাউকে বোঝাতে পারে।

- **সাহিবাইন (الصاحبان):** ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)।

৩. কিতাব ও বর্ণনার পরিভাষা (Terms of Books):

- **যাহিরুর রিওয়ায়া:** হানাফি মাযহাবের ভিত্তি ৬টি কিতাব।
- **আল-উম্ম:** শাফেয়ী মাযহাবের মূল কিতাব।
- **নস (النص):** মালেকী বা হাম্বলী মাযহাবে খোদ ইমামের স্পষ্ট উক্তিকে নস বলা হয়।

তুলনামূলক ফিকহে এগুলো জানার গুরুত্ব (أهمية معرفتها في الفقه المقارن):

একজন গবেষক যখন বিভিন্ন মাযহাবের তুলনা (মুকারানা) করেন, তখন পরিভাষা না জানলে তিনি মারাত্মক ভুল করতে পারেন:

১. ভুল বিধান দেওয়া থেকে রক্ষা: হানাফি মাযহাবে 'মাকরুহ তাহরিমি' মানে হারামের কাছাকাছি। কিন্তু শাফেয়ী মাযহাবে 'মাকরুহ' বললে সাধারণত মাকরুহ তানযীহি (অপছন্দনীয়) বোঝায়, যা হারাম নয়। গবেষক পরিভাষা না জানলে হানাফি মাকরুহকে শাফেয়ী মাকরুহের সাথে গুলিয়ে ফেলবেন।

২. সঠিক মত উদ্ধৃত করা (আমানতদারি): গবেষক যদি শাফেয়ী মাযহাবের কোনো কিতাবে দেখেন লেখা আছে "এই উক্তিটি 'সহীহ'", কিন্তু এর বিপরীতে আরেকটি উক্তি আছে "এটি 'আসাহ'"। তিনি যদি পরিভাষা না জানেন যে, শাফেয়ী মতে 'আসাহ' শব্দটি 'সহীহ'-এর চেয়ে শক্তিশালী, তবে তিনি দুর্বল মতটি (সহীহ) মাযহাবের মত হিসেবে চালিয়ে দেবেন।

৩. ইমামদের পরিচয় শনাক্তকরণ: কিতাবে লেখা আছে "শাইখাইন বলেছেন"। হানাফি ছাত্র মনে করবে আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ, আর শাফেয়ী ছাত্র মনে করবে নববী ও রাফেয়ী। তুলনামূলক ফিকহে এই বিভ্রান্তি দূর করা জরুরি।

উপসংহার (خاتمة): ফিকহী পরিভাষা হলো ফিকহ নামক দুর্গে প্রবেশের চাবিকাঠি। মাযহাবগুলোর মধ্যকার মতভেদ সঠিকভাবে বোঝার জন্য এবং একটি ইনসাফপূর্ণ তুলনামূলক গবেষণা উপস্থাপনের জন্য এই পরিভাষাগুলোর জ্ঞান অপরিহার্য। এটি ছাড়া ফিকহ চর্চা অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার শামিল।

প্রশ্ন-২৫: হানাফীদের নিকট 'আল-আসাহ' ও 'আর-রাজীহ' এবং শাফেয়ীদের নিকট 'আল-মুতামাদ' পরিভাষাগুলোর তাৎপর্য স্পষ্ট কর।
(وضح دلالة المصطلحين "الأصح" و"الراجح" عند الحنفية و"المعتمد" عند الشافعية.)

ভূমিকা (مقدمة): ফিকহী মাযহাবগুলোতে কোনো মাসআলায় একাধিক মত বা রিওয়ায়াত থাকলে মুফতি বা গবেষকের জন্য কোনটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তা বোঝার জন্য ফকিহগণ কিছু বিশেষ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। হানাফি ও শাফেয়ী মাযহাবে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে বিধানের শক্তিমত্তা বোঝাতে **'আল-আসাহ'**, **'আর-রাজীহ'** এবং **'আল-মুতামাদ'** পরিভাষাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিভাষাগুলোর সঠিক মর্ম না বুঝলে ফতোয়া প্রদানে মারাত্মক ভুলের আশঙ্কা থাকে।

হানাফি মাযহাবে 'আল-আসাহ' ও 'আর-রাজীহ' (الأصح والراجح عند الحنفية):

হানাফি মাযহাবের ফতোয়ার কিতাবসমূহে (যেমন— হিদায়া, রদ্দুল মুহতার) মতভেদের ক্ষেত্রে দলীলের শক্তি বোঝাতে এই দুটি শব্দ বহুল ব্যবহৃত হয়।

১. আল-আসাহ (الأصح) - অধিকতর শুদ্ধ:

- **সংজ্ঞা (تعريف):** যখন কোনো মাসআলায় ইমামগণের একাধিক মত থাকে এবং সবগুলোই দলীল বা রিওয়ায়াতের দিক থেকে 'সহীহ' (শুদ্ধ) হয়, তখন তুলনামূলকভাবে যে মতটি বেশি শক্তিশালী, তাকে 'আল-আসাহ' বলা হয়।

- **তাৎপর্য (دلالة):** 'আল-আসাহ' শব্দটি ব্যবহারের অর্থ হলো, এর বিপরীতে যে মতটি আছে, সেটি 'ভুল' বা 'বাতিল' (ফাসেদ) নয়, বরং সেটিও 'সহীহ'। কিন্তু ফতোয়ার জন্য 'আল-আসাহ' মতটিকেই গ্রহণ করতে হবে।

- **উদাহরণ (مثال):** কোনো মাসআলায় ইমাম কুদুরী (রহ.) বললেন "এটি সহীহ", কিন্তু ইমাম মারগীনানী (রহ.) বললেন "ওটি আসাহ"। এমতাবস্থায় মুফতিকে 'আসাহ' মতের ওপর ফতোয়া দিতে হবে।

২. আর-রাজীহ (الراجح) - অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত:

- **সংজ্ঞা:** দলীলের প্রবলতা বা যুক্তির শক্তির কারণে যে মতটিকে ফকিহগণ প্রাধান্য দিয়েছেন, তাকে 'আর-রাজীহ' বলা হয়।
- **তাৎপর্য:** এটি সাধারণত তখন ব্যবহার করা হয় যখন দুটি দলীলের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং গবেষক মুফতি একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেন। 'রাজীহ' মতের বিপরীত মতটিকে 'মারজুহ' (দুর্বল) বলা হয়, যার ওপর আমল করা জায়েজ নেই।

শাফেয়ী মাযহাবে 'আল-মুতামাদ' (المعتمد عند الشافعية):

শাফেয়ী মাযহাবে ফতোয়া প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বোঝাতে এই পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়।

১. আল-মুতামাদ (المعتمد):

- **সংজ্ঞা:** শাফেয়ী মাযহাবের পরবর্তী যুগের (মুতাক্ষিরীন) ফকিহগণের যাচাই-বাছাইয়ের পর যে মতটি ফতোয়ার জন্য চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত হয়েছে, তাকে 'আল-মুতামাদ' বলা হয়।
- **তাৎপর্য:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অনেকগুলো মত থাকতে পারে (কওলে কাদীম ও জাদীদ)। কিন্তু মাযহাবের দুই প্রধান স্তম্ভ—ইমাম নববী ও ইমাম রাফেয়ী (রহ.) যে মতের ওপর একমত হয়েছেন, অথবা পরবর্তীকালে ইবনে হাজার হাইতামী ও ইমাম রমলী (রহ.) যেটিকে ফতোয়াযোগ্য বলেছেন, সেটিই 'মুতামাদ'।
- **গুরুত্ব:** শাফেয়ী মুফতির জন্য 'মুতামাদ' মত ছাড়া অন্য কোনো মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া জায়েজ নেই।

তুলনামূলক পার্থক্য (الفرق):

পরিভাষা	মাযহাব	অর্থ ও তাৎপর্য
আল-আসাহ (الأصح)	হানাফি	দুটির মধ্যে অধিকতর শুদ্ধ। বিপরীত মতটিও শুদ্ধ (সহীহ) হতে পারে, তবে দুর্বল।

আর-রাজীহ (الراجح)	হানাফি	দলীলের বিচারে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। বিপরীত মতটি আমলযোগ্য নয়।
আল-মুতামাদ (المعتمد)	শাফেয়ী	মাযহাবের চূড়ান্ত নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত। এর বাইরে ফতোয়া চলে না।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, হানাফি মাযহাবে 'আসাহ' শব্দটি মতভেদের তুলনামূলক অবস্থান নির্দেশ করে, আর শাফেয়ী মাযহাবে 'মুতামাদ' শব্দটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্দেশ করে। তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের সময় এই সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো মনে রাখা গবেষকের জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন-২৬: মালেকী মাযহাবে 'আল-মাশহুর' (প্রসিদ্ধ) এবং 'আল-মানসুস আলাইহি' (সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত) পরিভাষা দুটির মধ্যে পার্থক্য কী?
ما هو الفرق بين مصطلح "المشهور" و"المنصوص عليه" في المذهب (المالكي؟)

ভূমিকা (مقدمة): মালেকী ফিকহ অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির, কারণ এর ভিত্তি হলো মদিনাবাসীর আমল। মালেকী মাযহাবের কিতাবসমূহে (যেমন— মুদাওয়ানা, মুখতাসার খলিল) কোনো বিধান সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে **'আল-মাশহুর'** এবং **'আল-মানসুস আলাইহি'** পরিভাষা দুটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং মুফতিকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তিনি কোনটির ওপর ফতোয়া দেবেন।

১. আল-মানসুস আলাইহি (المنصوص عليه):

সংজ্ঞা (تعريف): 'নস' (نص) অর্থ সুস্পষ্ট বক্তব্য। মালেকী পরিভাষায় 'আল-মানসুস' বলতে বোঝায় খোদ ইমাম মালিক (রহ.)-এর নিজের মুখের বাণী বা সুস্পষ্ট উক্তি।

বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা:

- এটি মাযহাবের মূল ভিত্তি। ইমাম মালিকের সরাসরি বক্তব্য তাঁর ছাত্ররা (যেমন— ইবনে কাসিম, আশহাব) বর্ণনা করেছেন।

- সাধারণত ইমামের 'নস' বা বক্তব্যই মাযহাবের প্রধান মত হওয়ার কথা। কিন্তু মালেকী মাযহাবে সব সময় ইমামের ব্যক্তিগত উক্তিকেই চূড়ান্ত ধরা হয় না, যদি না তা মাযহাবের অধিকাংশ ফকিহ গ্রহণ করেন।

২. আল-মাশহুর (المشهور):

সংজ্ঞা (تعريف): 'মাশহুর' অর্থ প্রসিদ্ধ। মালেকী মাযহাবে 'আল-মাশহুর' বলতে এমন মতকে বোঝায়, যা মাযহাবের অধিকাংশ ফকিহ (জমহুর) গ্রহণ করেছেন এবং যার ওপর ভিত্তি করে মদিনায় বা মালেকী অঞ্চলগুলোতে ফতোয়া ও আমল জারি আছে।

প্রকারভেদ (أقسام المشهور): মালেকী ফকিহগণ 'মাশহুর'কে দুইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

১. **দলিলের বিচারে প্রসিদ্ধ (মশহুর বিল-দালীল):** যেই মতটির স্বপক্ষে দলিল শক্তিশালী।

২. **সংখ্যার বিচারে প্রসিদ্ধ (মশহুর বিল-কওল):** যেই মতটি মাযহাবের অধিকাংশ অনুসারী গ্রহণ করেছেন (যদিও ইমাম মালিকের ভিন্ন মত থাকতে পারে)।

পার্থক্য ও ফতোয়ার বিধান (الفرق والحكم في الفتوى):

এই দুটি পরিভাষার মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে মালেকী মাযহাবে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করা হয়:

বিষয়	আল-মানসুস (ইমামের উক্তি)	আল-মাশহুর (প্রসিদ্ধ মত)
উৎস	সরাসরি ইমাম মালিক (রহ.) থেকে বর্ণিত।	মাযহাবের অধিকাংশ ফকিহ বা শক্তিশালী দলীলের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।
বিরোধ হলে করণীয়	যদি 'মানসুস' মতটি 'মাশহুর'-এর বিপরীত হয় এবং মাযহাবের ফকিহরা তা গ্রহণ না করেন, তবে এটি 'শায' বা একক মত হিসেবে গণ্য হতে পারে।	বিরোধের ক্ষেত্রে ফতোয়া ও বিচারকার্যে **'আল-মাশহুর'**-এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। কারণ এটিই মাযহাবের স্থিতিশীল রূপ।

উদাহরণ (مثال): ইমাম মালিক (রহ.) হয়তো কোনো এক মাসআলায় একটি কঠোর মত ব্যক্ত করেছিলেন (মানসুস)। কিন্তু তাঁর ছাত্ররা এবং পরবর্তী ফকিহগণ মদিনার আমল ও জনকল্যাণ বিবেচনা করে অন্য একটি মতকে গ্রহণ করেছেন এবং সেটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে (মাশহুর)। এমতাবস্থায় মালেকী মুফতি 'মাশহুর'-এর ওপরই ফতোয়া দেবেন।

উপসংহার (خاتمة): সুতরাং, মালেকী মাযহাবে 'মানসুস' হলো ইমামের ব্যক্তিগত মতের দলিল, আর 'মাশহুর' হলো মাযহাবের সামষ্টিক সিদ্ধান্ত। বিচার ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে মালেকী ফিকহে ব্যক্তির চেয়ে 'মাশহুর' বা সামষ্টিক মতের গুরুত্ব বেশি, যা এই মাযহাবের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন-২৭: হানাফী মাযহাবে 'আলাইহিল আমাল' (যদনুসারে আমল করা হয়) বা 'আল্লাযী বিহিল ফতোয়া' (যা দিয়ে ফতোয়া দেওয়া হয়) পরিভাষাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

اشرح دلالة مصطلح "عليه العمل" أو "الذي به الفتوى" في المذهب الحنفي.)

ভূমিকা (مقدمة): হানাফি ফিকহে মাসায়েল বা বিধানের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর ছাত্রদের (সাহিবাইন) মধ্যে বহু বিষয়ে মতভেদ আছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী যুগের ফকিহগণ ফতোয়া প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট কিছু শব্দবন্ধ বা পরিভাষা ব্যবহার করে সঠিক পথ বাতলে দিয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসূচক পরিভাষা হলো **'আলাইহিল আমাল'** (عليه العمل) এবং **'আল্লাযী বিহিল ফতোয়া'** (الذي به الفتوى)।

পরিভাষাসমূহের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ:

১. আলাইহিল আমাল (عليه العمل):

- **অর্থ:** এর ওপরই আমল বা কার্যধারা অব্যাহত আছে।
- **তাৎপর্য:** এটি দ্বারা বোঝানো হয় যে, যদিও কিতাবে অন্য কোনো শক্তিশালী দলিল বা 'কিয়াস' থাকতে পারে, কিন্তু যুগ ও পরিবেশের চাহিদার কারণে ফকিহগণ এবং বিচারকগণ (কাজী) বাস্তবে এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। তাই এখন এটিই আইন।

২. **আল্লাযী বিহিল ফতোয়া (الذي به الفتوى):**

- **অর্থ:** এই মত দিয়েই ফতোয়া দেওয়া হয়।
- **তাৎপর্য:** মাযহাবের মুফতিগণের জন্য এটি একটি নির্দেশিকা। এর অর্থ হলো, এই মাসআলায় অন্য কোনো মত (তা ইমামে আজমের হোক বা অন্য কারো) গ্রহণ করার সুযোগ নেই। এটি 'ইখতিয়ার' বা নির্বাচনের পথ বন্ধ করে দেয়।

তাৎপর্য ও প্রয়োগ (الدلالة والتطبيق):

হানাফি উসূলুল ইফতার কিতাবসমূহে (যেমন— শরহু উকূদি রসমিল মুফতি) এই পরিভাষাগুলোর বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে:

১. যাহিরুর রিওয়ায়ার ওপর প্রাধান্য (تقديم على ظاهر الرواية): সাধারণ নিয়ম হলো, ফতোয়া 'যাহিরুর রিওয়ায়া'-এর ওপর হবে। কিন্তু যদি কোনো মাসআলায় ফকিহগণ স্পষ্ট করে বলেন "আলাইহিল ফতোয়া" বা "আলাইহিল আমাল" এবং সেই মতটি 'যাহিরুর রিওয়ায়া'র বিপরীত হয়, তবুও **'আলাইহিল ফতোয়া' মতটিই অগ্রাধিকার পাবে**।

২. যুগের পরিবর্তন ও জরুরত (تغير الزمان والضرورة): সাধারণত এই পরিভাষাগুলো ব্যবহার করা হয় যখন যুগের পরিবর্তনের কারণে (ফাসাদুয যামান) মূল বিধানের ওপর আমল করা কঠিন হয়ে পড়ে।

- **উদাহরণ:** হানাফি মাযহাবের মূল নীতি (যাহিরুর রিওয়ায়া) অনুযায়ী, কুরআন শিক্ষা বা আজান দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ নেই। কিন্তু পরবর্তী ফকিহগণ দেখলেন, এই হুকুম বহাল থাকলে কেউ আর কুরআন শেখাবে না এবং দ্বীন ধ্বংস হবে। তাই তাঁরা পরবর্তী যুগের আলেমদের মত গ্রহণ করে বললেন: "শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েজ— **ওয়া আলাইহিল ফতোয়া** (এবং এর ওপরই ফতোয়া)।"

৩. মুফতির করণীয় (واجب المفتي): একজন মুকাল্লিদ মুফতির জন্য ওয়াজিব হলো, যেখানেই তিনি কিতাবে 'বিহি ইউফতা' বা 'আলাইহিল আমাল' দেখবেন, চোখ বন্ধ করে সে অনুযায়ী ফতোয়া দেবেন। নিজের বিদ্যা বা কিয়াস খাটিয়ে

এর বিরোধিতা করা তার জন্য নাজায়েজ। কারণ, মাযহাবের বিজ্ঞ আলেমগণ বুঝেই এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, 'আলাইহিল আমাল' এবং 'বিহি ইউফতা' পরিভাষাগুলো হানাফি ফিকহের নমনীয়তা এবং যুগোপযোগী হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এগুলো মুফতিকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে এবং উম্মাহর জন্য সহজ ও কল্যাণকর বিধান নিশ্চিত করে। এই পরিভাষাগুলো মাযহাবের 'স্থির' ও 'পরিবর্তনশীল' বিধানের পার্থক্যকারী সীমারেখা।

প্রশ্ন-২৮: ফিকহী পরিভাষাগুলো না জানা কীভাবে তুলনামূলক ফিকহে অগ্রাধিকার প্রদানের (তারজীহ) প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে?

(كيف يؤثر عدم معرفة المصطلحات الفقهية على عملية الترجيح في الفقه المقارن؟)

ভূমিকা (مقدمة): 'আল-ফিকহুল মুকারান' বা তুলনামূলক ফিকহের মূল কাজ হলো বিভিন্ন মাযহাবের মতামত ও দলীলের তুলনা করে একটি শক্তিশালী মতকে অগ্রাধিকার বা 'তারজীহ' দেওয়া। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি মাযহাবের নিজস্ব পরিভাষা বা 'মুসতালাহাত' (مصطلحات) চাবিকাঠির ভূমিকা পালন করে। গবেষক যদি এই পরিভাষাগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ হন, তবে তার গবেষণা বিভ্রান্তিকর হতে বাধ্য এবং ভুল সিদ্ধান্তের (তারজীহ) দিকে নিয়ে যাবে।

পরিভাষা না জানার নেতিবাচক প্রভাবসমূহ (الآثار السلبية لعدم معرفة المصطلحات):

ফিকহী পরিভাষা না জানলে তারজীহ প্রক্রিয়ায় যে ধরনের সমস্যা ও প্রভাব পড়ে, তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. বিধানের শক্তিমত্তা নির্ণয়ে ব্যর্থতা (الفشل في تحديد قوة الحكم): প্রতিটি মাযহাবে বিধানের স্তর ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষায় ব্যক্ত করা হয়।

- **উদাহরণ:** হানাফি মাযহাবে 'ফরজ' (فرض) এবং 'ওয়াজিব' (واجب) দুটি ভিন্ন বিধান। ফরজ অকাট্য দলিলে প্রমাণিত, যা অস্বীকার করলে কুফরি হয়। কিন্তু ওয়াজিব প্রবল ধারণা (যন্নী) দ্বারা প্রমাণিত। অন্যদিকে শাফেয়ী বা হাম্বলী মাযহাবে সাধারণত ফরজ ও ওয়াজিব সমার্থক।

- **প্রভাব:** গবেষক যদি এই পার্থক্য না জানেন, তবে তিনি হানাফিদের 'ওয়াজিব'কে অন্যান্য মাযহাবের 'ফরজ'-এর চেয়ে দুর্বল মনে করে ভুল তারজীহ দিতে পারেন, অথচ আমলগত দিক থেকে উভয়ই আবশ্যক।

২. মাকরুহ ও হারামের পার্থক্য বুঝতে ভুল করা: হানাফি মাযহাবে 'মাকরুহ' দুই প্রকার: তাহরিমি (হারামের কাছাকাছি) ও তানযীহি (অপছন্দনীয়)। কিন্তু শাফেয়ী মাযহাবে শুধু 'মাকরুহ' বললে সাধারণত তানযীহি বোঝায়।

- **প্রভাব:** গবেষক যদি হানাফি কিতাবের 'মাকরুহ' শব্দ দেখে মনে করেন এটি সাধারণ অপছন্দনীয় কাজ, তবে তিনি বড় ভুল করবেন এবং তুলনামূলক বিচারে হানাফি মতের কঠোরতা অনুধাবনে ব্যর্থ হবেন।

৩. নির্ভরযোগ্য মত চিনতে ভুল করা (الخطأ في معرفة القول المعتمد): তারজীহ দেওয়ার জন্য মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মতটি জানতে হয়। কিন্তু পরিভাষা না জানলে দুর্বল মতকে সবল মনে হতে পারে।

- **উদাহরণ:** শাফেয়ী মাযহাবে 'সহীহ' (صحيح) এবং 'আসাহ' (أصح) দুটি পরিভাষা। 'আসাহ' শব্দটি প্রমাণ করে যে এর বিপরীতেও একটি শুদ্ধ মত আছে, কিন্তু 'আসাহ' বেশি শক্তিশালী। গবেষক যদি শুধু 'সহীহ' দেখে সিদ্ধান্ত নেন, তবে তিনি মাযহাবের দুর্বল মতটিকে প্রাধান্য দিয়ে ফেলবেন।

৪. ইমাম ও ফকিহদের শনাক্তকরণে বিভ্রান্তি: বিভিন্ন মাযহাবে একই উপাধি ভিন্ন ব্যক্তিকে বোঝায়।

- **উদাহরণ:** ফিকহী কিতাবে 'শাইখাইন' (الشيخان) শব্দটি প্রচুর ব্যবহৃত হয়। হানাফি গবেষক মনে করবেন ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ। কিন্তু শাফেয়ী কিতাবে এটি দ্বারা ইমাম নববী ও রাফেয়ীকে বোঝায়। এই ভুল বুঝাবুঝির ফলে গবেষক এক যুগের ইজমা বা রায়কে অন্য যুগের ওপর চাপিয়ে ভুল তারজীহ দেবেন।

৫. কিতাবের মর্যাদা বুঝতে অক্ষমতা: হানাফি মাযহাবে 'যাহিরুর রিওয়ায়া'র কিতাবগুলোই মূল ভিত্তি। গবেষক যদি 'নাওয়াদির' (বিরল বর্ণনা) বা 'গাইরে মুতামাদ' কিতাবের পরিভাষা না জানেন, তবে তিনি অপ্রচলিত মতকে মাযহাবের মূল মত হিসেবে চালিয়ে দেবেন। এতে তারজীহ প্রক্রিয়া পুরোটাই বাতিল হয়ে যাবে।

৬. দলীল ও যুক্তির ভুল প্রয়োগ: কখনো কখনো পরিভাষা দ্বারা দলীলের ধরন বোঝানো হয়। যেমন— মালেকী মাযহাবে 'নস' (النص) মানে ইমাম মালিকের নিজস্ব উক্তি, কোনো হাদিস নয়। গবেষক যদি একে হাদিসের 'নস' মনে করেন, তবে দলীলের তুলনামূলক বিচারে তিনি বিভ্রান্ত হবেন।

উপসংহার (خاتمة): সারকথা হলো, ফিকহী পরিভাষা হলো মাযহাবের ভাষা। ভাষা না বুঝলে যেমন ভাব বিনিময় অসম্ভব, তেমনি পরিভাষা না জানলে সঠিক তারজীহ প্রদান অসম্ভব। এটি গবেষককে অন্ধকারের হাতড়ানো থেকে রক্ষা করে এবং সত্য ও সঠিক বিধান (হক) উদঘাটনে সহায়তা করে। তাই তুলনামূলক ফিকহ চর্চার পূর্বশর্ত হলো পরিভাষার জ্ঞান।

প্রশ্ন-২৯: প্রতিটি মাযহাবে 'ফকীহদের স্তরসমূহ' কী কী? পরিভাষা বোঝা ও অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব কী?

ما هي "طبقات الفقهاء" عند كل مذهب؟ وما أهميتها في فهم المصطلحات (والترجيح؟)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানসমুদ্রে সকল আলেম বা ফকিহ সমান মর্যাদার নন। ইজতেহাদ ও ফতোয়া প্রদানের যোগ্যতার ভিত্তিতে ফকিহগণকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। একে বলা হয় 'তবাকাতুল ফুকাহা' (طبقات الفقهاء)। বিশেষ করে হানাফি মাযহাবে এই স্তরবিন্যাস অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও গুরুত্বপূর্ণ। কোন ফকিহের কথা কার ওপর প্রাধান্য পাবে, তা এই স্তরের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়।

ফকিহদের স্তরসমূহ (طبقات الفقهاء):

আল্লামা ইবনে কামাল পাশা (রহ.) হানাফি মাযহাবের ফকিহদের **সাতটি স্তরে** ভাগ করেছেন। অন্যান্য মাযহাবেও অনুরূপ শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। নিচে হানাফি স্তরগুলো বিস্তারিত দেওয়া হলো:

১. শরীয়তের মুজতাহিদ (مجتهد في الشرع): এরা হলেন মুজতাহিদে মুতলাক বা স্বাধীন মুজতাহিদ। তাঁরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি উসূল ও ফুরু (মূলনীতি ও শাখা) বের করেন। কারো অনুসরণ করেন না।

- **উদাহরণ:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (রহ.)।

২. মাযহাবের মুজতাহিদ (مجتهد في المذهب): তাঁরা উসূল বা মূলনীতির ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করেন, কিন্তু শাখা মাসায়েল বের করার ক্ষেত্রে নিজস্ব ইজতেহাদ প্রয়োগ করেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)।

৩. মাসায়েলের মুজতাহিদ (مجتهد في المسائل): যেসব বিষয়ে ইমাম থেকে কোনো রিওয়ায়াত নেই, তাঁরা কেবল সেসব বিষয়ে ইজতেহাদ করেন। তবে উসূল ও ফুরু উভয় ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম খাসসাফ, ইমাম তাহাবী, ইমাম কারখী (রহ.)।

৪. আসহাবুত তাখরীজ (أصحاب التخريج): তাঁরা ইজতেহাদ করতে পারেন না, কিন্তু অস্পষ্ট উক্তি বা দ্ব্যর্থবোধক মাসআলাকে মূলনীতির আলোকে স্পষ্ট (তাখরীজ) করতে পারেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম জাসসাস আর-রাজী (রহ.)।

৫. আসহাবুত তারজীহ (أصحاب الترجيح): তাঁরা বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে কোনটি শক্তিশালী, তা নির্ধারণ করেন। যেমন— "এই মতটি উত্তম", "ওটি সহীহ" ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম কুদুরী, বুরহান উদ্দিন আল-মারগীনানী (হেদায়া প্রণেতা)।

৬. আসহাবুত তাময়ীজ (أصحاب التمييز): তাঁরা শক্তিশালী, দুর্বল, এবং বাতিল মতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। তাঁরা কিতাবে কেবল নির্ভরযোগ্য মতগুলো স্থান দেন।

- **উদাহরণ:** আল্লামা নাসাফী, আল্লামা ইবনে মওদুদ আল-মাওসিলী।

৭. মুকাল্লিদ মাহদ (مقلد محض): এরা কেবল অনুসরণকারী। এদের কাজ হলো পূর্ববর্তীদের কিতাব থেকে ফতোয়া নকল করা। এদের নিজস্ব কোনো রায় দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

- **উদাহরণ:** পরবর্তী যুগের সাধারণ মুফতিগণ।

পরিভাষা বোঝা ও অগ্রাধিকার প্রদানে এর গুরুত্ব (الأهمية في الفهم والترجيح):

১. মতবিরোধ নিরসন: যদি ইমাম তাহাবী (৩য় স্তর) এবং আল্লামা শামী (পরবর্তী যুগের ফকিহ)-এর মতের মধ্যে বিরোধ হয়, তবে নীতি অনুযায়ী ইমাম তাহাবীর মত প্রাধান্য পাবে। কারণ তিনি উচ্চ স্তরের মুজতাহিদ। এই স্তর না জানলে গবেষক ভুল ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেবেন।

২. তারজীহ বা প্রাধান্য দেওয়ার অধিকার: কেবলমাত্র 'আসহাবুত তারজীহ' (৫ম স্তর) বা তার উপরের স্তরের ফকিহরাই মতের প্রাধান্য দিতে পারেন। একজন সাধারণ মুফতি (৭ম স্তর) নিজের যুক্তিতে ইমামের মতকে দুর্বল বলতে পারেন না। এটি জানলে ফতোয়ায় বিশৃঙ্খলা কমে।

৩. পরিভাষার সঠিক প্রয়োগ: কোন কিতাবে 'সহীহ' বা 'আসাহ' লেখা থাকলে বুঝতে হবে লেখক কোন স্তরের। যদি তিনি 'আসহাবুত তাময়ীজ' হন, তবে তার এই রায় গ্রহণযোগ্য। আর যদি সাধারণ কেউ হন, তবে তা ধর্তব্য নয়।

উপসংহার (خاتمة): ফকিহদের এই স্তরবিন্যাস ফিকহ শাস্ত্রের মানদণ্ড। এটি গবেষককে শেখায় কার কথা গ্রহণ করতে হবে এবং কার কথা বর্জন করতে হবে। তুলনামূলক ফিকহে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এই চেইন অব কমান্ড মানা অপরিহার্য।

প্রশ্ন-৩০: 'ফিকহী মাযহাবের পরিভাষাসমূহ' বোঝা ও এগুলো দ্বারা দলীল পেশ করার ক্ষেত্রে 'ক্বাওয়ায়েদুল ফিকহ' (ফিকহী মূলনীতি)-এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

(ناقش أهمية "قواعد الفقه" في فهم "مصطلحات المذاهب الفقهية" والاستدلال بها.)

ভূমিকা (مقدمة): 'আল-ক্বাওয়ায়েদুল ফিকহিয়্যাহ' (القواعد الفقهية) বা ফিকহী মূলনীতিসমূহ হলো ইসলামী আইনের নির্যাস। এগুলো এমন সংক্ষিপ্ত বাক্য যা হাজার হাজার ফিকহী মাসআলাকে অন্তর্ভুক্ত করে। মাযহাবের পরিভাষাগুলো (Terms) প্রায়শই এই কায়দা বা মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে।

তাই পরিভাষা বোঝা এবং তুলনামূলক ফিকহে দলীল পেশ করার ক্ষেত্রে কায়দাগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গভীর।

ক্বাওয়ায়েদুল ফিকহ-এর সংজ্ঞা (تعريف قواعد الفقه): পারিভাষিক অর্থে, এটি এমন একটি সামগ্রিক বিধান (হুকুম কুল্লি) যা তার অধীনস্থ সকল বা অধিকাংশ শাখার বিধান বর্ণনা করে। উদাহরণ: **"আল-উমুর বি-মাকাসিদিহা"** (কাজ তার উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভরশীল)।

পরিভাষা বোঝার ক্ষেত্রে কায়দার গুরুত্ব (الأهمية في فهم المصطلحات):

১. পরিভাষার মর্মার্থ অনুধাবন: অনেক ফিকহী পরিভাষা সরাসরি কোনো না কোনো কায়দা থেকে এসেছে।

- **উদাহরণ:** 'রুখসত' (সহজতা) একটি পরিভাষা। এটি বোঝার জন্য **"আল-মাশাক্কাতু তাজিলবুত তাইসীর"** (কষ্ট সহজতাকে ডেকে আনে) কায়দাটি জানতে হয়। গবেষক যখন এই কায়দা জানবেন, তখন তিনি বুঝবেন কেন সফরে নামাজ কসর করা বা রোজার কাজা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং কখন এই 'রুখসত' পরিভাষাটি প্রয়োগ করা যাবে।

২. অস্পষ্ট পরিভাষা স্পষ্টকরণ: কখনো কখনো মুফতিরা 'জরুরত' (অপরিহার্যতা) শব্দটি ব্যবহার করেন। এটি কতটুকু জরুরি? তা বোঝার জন্য **"আদ-দারাউরাত তুবীহুল মাহযূরাত"** (অপরিহার্যতা নিষিদ্ধকে বৈধ করে) এবং **"আদ-দারাউরাত তুকাদদারু বি-কাদারিহা"** (অপরিহার্যতা তার প্রয়োজন অনুপাতে নির্ধারিত হয়)—এই কায়দাগুলো জানতে হবে। নতুবা মুফতি সামান্য প্রয়োজনে হারামকে হালাল বলে ফতোয়া দিতে পারেন।

৩. উরফ বা প্রথা বিষয়ক পরিভাষা: মাযহাবে 'উরফ' একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কিন্তু কোন উরফ গ্রহণযোগ্য? তা **"আল-আদাতু মুহাক্কামাহ"** (প্রথা বিচারকের ভূমিকা পালন করে) কায়দার আলোকে নির্ধারিত হয়। এই কায়দা জানলে গবেষক বুঝবেন কেন হানাফি মাযহাবে অনেক ক্ষেত্রে কিতাবের বর্ণনার চেয়ে সমাজের প্রচলনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

দলীল পেশ করার ক্ষেত্রে কায়দার গুরুত্ব (الأهمية في الاستدلال):

১. নস বা দলীল না থাকলে সমাধান: আধুনিক যুগে এমন অনেক সমস্যা (নাওয়াজিল) আসে যার সরাসরি সমাধান কুরআন-হাদিসে নেই। তখন ফিকহী কায়দাগুলোই 'দলীল' হিসেবে কাজ করে।

- **উদাহরণ:** কারো ধোঁপায় ভুলে অন্যের ক্ষতি হলো। এখানে সরাসরি হাদিস না থাকলেও **"লা দারারা ওয়া লা দিরা"** (ক্ষতি করাও নেই, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও নেই) কায়দা দিয়ে ক্ষতিপূরণের বিধান দেওয়া হয়।

২. তারজীহ প্রদানে সহায়তা: তুলনামূলক ফিকহে যখন দুই মাযহাবের দলীল সাংঘর্ষিক হয়, তখন যে মতটি ফিকহী কায়দার (শরীয়তের মাকাসিদ) সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

- **উদাহরণ:** এক মতে ক্ষতি হয়, অন্য মতে ক্ষতি দূর হয়। এখানে **"ইজা তাআরাদা মাফসা-দাতানি"** (দুই ক্ষতি মুখোমুখি হলে কম ক্ষতি গ্রহণ করা) কায়দা অনুযায়ী কম ক্ষতির মতটি গ্রহণ করা হবে।

৩. ফিকহী যুক্তির ভিত্তি: গবেষক যখন বলেন, "এটি জায়েজ কারণ এতে মানুষের কল্যাণ আছে", তখন তার এই কথার ভিত্তি হয় **"তাসাররুফুল ইমাম আলা রায়িয়্যাহ মানুতুন বিল মাসলাহাহ"** (জনগণের ওপর শাসকের পদক্ষেপ কল্যাণের সাথে যুক্ত হতে হবে) কায়দাটি।

উপসংহার (خاتمة): ফিকহী কায়দাগুলো হলো ফিকহ শাস্ত্রের ব্যাকরণ। ব্যাকরণ ছাড়া যেমন ভাষা শুদ্ধ হয় না, তেমনি ক্বাওয়ায়েদুল ফিকহ ছাড়া মাযহাবের পরিভাষা বোঝা এবং সঠিক দলীল পেশ করা অসম্ভব। মুফতী সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসান (রহ.)-এর 'কাওয়ায়েদুল ফিকহ' গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনবদ্য পাথেয়।